সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ডিসেম্বর ২০২৩

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ

ভারতের আন্তর্জাতিক তৎপরতা

১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে ভারতের কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদানের ৫২তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রতি বছর উদ্‌যাপিত 'মৈত্রী দিবস'-এ সম্মানিত অতিথি হিসেবে মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বাংলাদেশের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩-এ ভারতীয় হাই কমিশনে ডিসিসিআই-এর নতুন সভাপতি জনাব আশরাফ আহমেদের নেতৃত্বে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) নবনির্বাচিত পদাধিকারীগণকে স্বাগত জানান। আলোচনা সভায় ডিসিসিআই-এর অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মালিক তালহা ইসমাইল বারী, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট; জনাব মোঃ জুনায়েদ ইবনা আলী, ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জনাব তাসকিন আহমেদ, ডিরেক্টর।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ১২ | অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩০ | ডিসেম্বর ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
উত্তরপ্রদেশ

উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের একটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। যা দুটি প্রধান নদী গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থল নামে পরিচিত। রাজ্যটি তার সম্পদ, স্থাপত্য, ইতিহাস, উৎপাদন, শিল্প-কারুশিল্প ও নদী দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে।

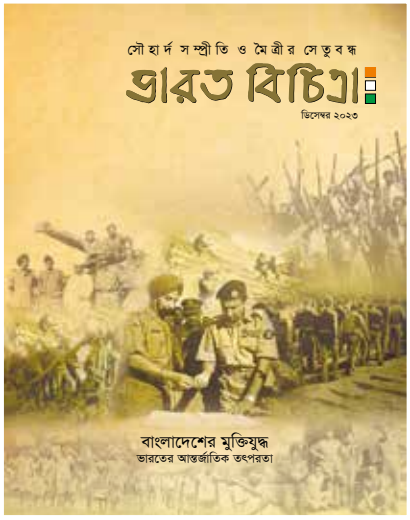

সূচিপত্র

কর্মযোগ	মৈত্রী দিবস ২০২৩ ০৩
প্রচ্ছদরচনা	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের আন্তর্জাতিক তৎপরতা ॥ হাসানুর রশীদ ০৪
মৈত্রী	সৌহার্দের স্মারক ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দিবস ॥ দীপংকর গৌতম ০৮
প্রবন্ধ	বিশ্বমানব অতীশ দিপংকর ॥ সালেহা চৌধুরী ১০
	যোগেন মণ্ডলের দেবেশ রায় ॥ চৈতন্য চন্দ্র দাস ১৮
সার্ধশত জন্মবর্ষ	শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী তপন চক্রবর্তী ১২
জন্মশতবর্ষ	গল্পের নিরিখে সমরেশ বসু ॥ অলাত এহ্সান ১৫
পঙ্‌ক্তিমালা	দিলারা হাফিজ ॥ তিলোত্তমা বসু ॥ সৈকত রহমান ॥ হেনরী স্বপন মোস্তাক আহমাদ দীন ॥ মতিন রায়হান ॥ শাহ্‌নাজ মুন্নী বিনয় বর্মন ॥ দিলীপ কির্ত্তুনিয়া ॥ মনিরুল মোমেন ফারুখ সিদ্ধার্থ ॥ শফিউল শাহিন ॥ বাদল ধারা ॥ বাপি গাইন সৈকত ঘোষ ॥ সুমন মল্লিক ॥ আতিক আলতাফ ॥ সুজালো যশ ২২-২৪
গ্রন্থশতবর্ষ	'রক্তকরবী' : শতবর্ষ ফিরে দেখা ॥ আবু সাঈদ তুলু ২৫
	মৈমনসিংহ গীতিকা : শতবর্ষ পরে ॥ শহীদ ইকবাল ২৮
ছোটগল্প	মাটির টান ॥ পলি শাহীনা ৩২
ভ্রমণ	মির্জা গালিবের খোঁজে ॥ রাহেল রাজিব ৩৫
ধারাবাহিক উপন্যাস	বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৯
কেন্দ্রবিন্দু	উত্তরপ্রদেশ ॥ সৈয়দ শিহাব হোসেন ৪২
ফিচার	রবীন্দ্রজীবনে দশ নারী ॥ স্বপঞ্জয় চৌধুরী ৪৬
শেষ পাতা	গণসংগীত সম্রাট হেমাঙ্গ বিশ্বাস ॥ রকি গৌড়ি ৪৮

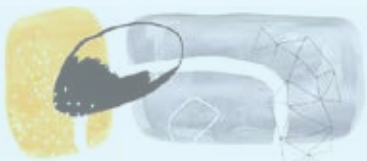

মৈত্রী দিবস ২০২৩

ভারতীয় হাই কমিশন-ঢাকা ০৬ ডিসেম্বর ২০২৩-এ গুলশানের ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে মৈত্রী দিবস উদ্‌যাপন করে। ১৯৭১ সালের এই দিনেই ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা তাঁর স্বাগত বক্তব্যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে গভীর ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, মৈত্রী দিবস বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতের অবিচল সমর্থনের প্রতীক এবং সহানুভূতি, সাম্য, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সংহতির মূলে থাকা অংশীদারিত্বের উৎপত্তিকে চিহ্নিত করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল এবং একটি স্থিতিশীল, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল বাংলাদেশের স্বপ্নকে সমর্থন জানিয়ে ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত রাখবে।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও লোকগীতি এবং বাদ্যযন্ত্র ও নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে এই মৈত্রী দিবস উদ্‌যাপন ভারত ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক পরম্পরা প্রদর্শন করে।

সম্পাদকীয়

১৯৪৭ সালের দেশভাগ, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান–এর ঐতিহাসিক পরম্পরায় বাঙালির ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসের তো বটেই বিশ্ব-ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব-মানচিত্রে নিজের জায়গা করে নিতে সমর্থ হয়। একই সাথে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। মুক্তিকামী বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলন বিশ্বব্যাপী শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত এবং পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে অনুপ্রাণিত করে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলনসহ পৃথিবীর তাবৎ মহিমান্বিত আন্দোলনের সঙ্গেই কেবল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তুলনীয়। স্বাধীনতাযুদ্ধে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জাতি বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছিল। এর মধ্যে ভারত বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যের সহযোগিতামূলক অংশগ্রহণের পাশাপাশি ভারত বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দান, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দান এবং অস্ত্র সরবরাহ করে। বিশেষত ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যে অবদান রেখেছেন তা ইতিহাসে বিরল এবং অতুলনীয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং সাধারণ জনগণের পূর্ণ সমর্থন ছিল। সেই সময়ে ভারতীয় জনগণ এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাংলাদেশের জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিল পূর্ণ অন্তর ও সামর্থ্য নিয়ে। ভারতের কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, শিল্পীসহ সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রায় সবাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং তাদের নিজ নিজ সৃজনকর্ম দিয়ে সম্পৃক্ত হন।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ১০ দিন আগে ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকারী দেশগুলোর মধ্যে ভারত অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যে প্রভাববিস্তারী একটি অনুষঙ্গ। একটি জাতি হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনেও মুক্তিযুদ্ধ দিকনির্দেশনামূলক প্রেরণা হিসেবে কাজ করে আসছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধই বাঙালি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম অর্জন। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে। তাই ভারত, বাংলাদেশ–দুই দেশের জন্যই দিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। স্বীকৃতির এই ঐতিহাসিক দিনটিকে একারণেই মৈত্রী দিবস হিসেবে দুদেশেই বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। এর মধ্য দিয়ে দুদেশের নিখাদ বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হয়ে প্রতিবছর নবতর খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই ধারাবাহিকতায় ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনও প্রতিবছর মৈত্রী দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে। ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশই প্রতিবেশীর প্রতি সহানুভূতি বজায় রেখে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। সহযোগিতা ও সাম্যভিত্তিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের এই মাধুর্য বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকও অনুভব করে থাকে।

নিয়মিত বিভাগসমূহ থেকে পাঠকগণ বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ গ্রহণ করতে পারবেন।

সকলের মঙ্গল হোক।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা (এল) যিনি বাংলাদেশের সাথে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের বিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন

প্রচ্ছদরচনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ভারতের আন্তর্জাতিক তৎপরতা

হাসানুর রশীদ

হাজার নদীর অববাহিকাময় দেশ–এই বাংলাদেশ মায়ের শুশ্রূষা বঞ্চিত সন্তানের ন্যায় একটি ভূখণ্ড। তার খণ্ডিত কিছু অংশ ব্যতীত বৃহত্তম অংশ না-পেয়েছে কোনোকালের রাজা কিংবা সম্রাট কিংবা নবাবদের পরিচর্যা। সে-ইতিহাস ঘাটতে গেলে দেখা যায়, এ-ভূখণ্ডের পুরোটা কখনো এ-মৃত্তিকার সন্তানেরা শাসন করেননি। এ-পুরো খণ্ডে কিংবা তার খণ্ডিতাংশে ছড়ি ঘুরিয়েছে দূর-দূরান্তের ক্ষমতাবান শাসকদের লেজুড় কিংবা সামন্ত-সন্তানেরা। ব্রিটিশ শাসনামলেও এ-ভূখণ্ডটি উন্নয়ন-উৎকর্ষের স্পর্শ পায়নি। লর্ড কার্জন সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করে এ-খণ্ডের উন্নয়ন-উৎকর্ষের কল্পনা করেছিলেন। তবে আরেক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতায় তার সে কল্পনা চিত্রকল্প হয়ে রয়ে গেছে। পরবর্তী লেবার পার্টি ব্রিটেনের সরকার গঠনের পর প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলি ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন। মূলত, প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্ট অ্যাটলির কৃপা ও পরিকল্পনা মোতাবেক ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে ইন্দিরা গান্ধী হোয়াইট হাউসে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আর আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ পাকিস্তানের খণ্ডিত অংশ হিসেবে স্বাধীন হয়। তবে তাতে এ-ভূখণ্ডের মানুষের ভাগ্যবদল হয়নি। তারা শ্বেতাঙ্গ শাসকদের পরিবর্তে বাদামি কিংবা ধূসরাঙ্গের শাসক পেয়েছে মাত্র। ফলে এ-ভূখণ্ডের মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অপরিবর্তিত থেকে যায়। ১৯৭১ এক স্বপ্নময় বর্ষ। এ-বর্ষের শেষপাদে ১৬ ডিসেম্বর রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ-ভূখণ্ডটি প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা লাভ করে এবং এ-দেশের শাসনভার এ-মৃত্তিকার সন্তানদের হস্তে অর্পিত হয়। প্রসঙ্গটি কিঞ্চিৎ পূর্বকাল থেকে শুরু করতে হচ্ছে–১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয়। পাকিস্তানের ৩০০ আসনের প্রত্যক্ষ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে বিজয় লাভ করে। ১৩টি সংরক্ষিত নারী আসন থেকে পায় ৭টি। এই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সত্ত্বেও পাকিস্তানের সামরিক সরকার আওয়ামী লীগের হাতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। পূর্ব নির্ধারিত ১৯৭১ সালের ৩ মার্চে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত করে। ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ভয়ংকর বিদ্রোহ দেখা দেয়। আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দেন। পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে চাইলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনায় বসেন। কিন্তু সামরিক সহযোগীদের পরামর্শে আলোচনা শেষ না করে তিনি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ঢাকা ত্যাগ করেন। সে-রাতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয় এবং একই রাতে দেশব্যাপী নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। এ-সংবাদ প্রচারের পর চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাতময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পশ্চিম পাকিস্তান সেনাবাহিনীও নৃশংসতা বাড়িয়ে দেয়। রাজনীতিবিদদের গণগ্রেফতার চলে। ফলে, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বড়ো অংশ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সামরিক সরকারের বিপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানিদের যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সে-সময় সংঘাতময় পরিস্থিতির পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত বিদেশি কূটনীতিকেরাও দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকে। এ-বিষয়টি দৃষ্টিগোচরান্তে ১৯৭১ সালের ৩১ মার্চ ভারতের লোকসভায় একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। সে-প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার প্রতিবাদ এবং বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্মম হত্যাকাণ্ড বন্ধে সামরিক সরকারকে বাধ্য করতে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে ভারত সরকারের আন্তর্জাতিক তৎপরতা শুরু হয়।

১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ কোলকাতায় অবস্থানকারী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে যুদ্ধকালীন সরকার গঠিত হয়। এ সরকার গঠনের পশ্চাতে সর্বোতভাবে ভারত সরকারের ভূমিকা ছিল। এ সরকার গঠনের একজন নেপথ্য কারিগর ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম তাঁর 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি' পুস্তিকায় লিখেছেন, ৪ এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ দ্বিতীয় বারের মতো ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ইন্দিরা গান্ধীর কাছেই তাজউদ্দীন আহমেদ শুনতে পান যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ভারত প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে অবস্থান করতে পারবে। যাবতীয় সহায়তা দেয়া হবে।'

ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় কোলকাতা ৮ নং থিয়েটার রোডের একটি বাড়িতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর স্থাপিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের কার্যক্রম শুরু হয়। এ-সময় ভারত সরকার প্রবাসী সরকারকে ৫০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ-এর একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার প্রদান করে। ফলে প্রবাসী সরকার কর্তৃক 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু হয়। এর মাধ্যমে প্রবাসী সরকার একদিকে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটন ও মুক্তিযোদ্ধাদের দূরবর্তী-অনুপ্রেরণা প্রদানে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে বহির্বিশ্বের কাছেও যুদ্ধকালীন বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দিতে পেরেছে। উল্লেখ্য যে, প্রবাসী সরকার গঠনে পরামর্শ, প্রত্যক্ষ সহযোগিতা কিংবা সম্প্রচার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেই ভারত সরকার থেকে যায়নি। ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। একই সাথে ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির কাজ শুরু করে। সে-সময় ভারত সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের পৃষ্ঠপোষক মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহের প্রধানদের নিকট বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ, গণরায় বাস্তবায়ন ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের প্রভাবশালী নেতা ও মিশরের রাষ্ট্রপতি আনোয়ার সাদাতকে বাংলাদেশে চলমান নৃশংসতা ও গণহত্যার বিবরণ তুলে ধরে সহানুভূতিশীল করতে একটি কূটনৈতিক পত্র প্রেরণ করেন। এ-সময় তিনি বাংলাদেশে চলমান নৃশংসতা ও গণহত্যা তুলে ধরতে

১৯৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করছেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অন্যান্য অভিযোগে ১১ আগস্ট থেকে সামরিক আদালতে বিচারকার্য শুরু করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে

ধারাবাহিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। তিনি বিবিসি, নিউইয়র্ক টাইমস, লন্ডন টাইমসে দেওয়া সাক্ষাৎকারসমূহে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের যৌক্তিকতাও তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি পাকিস্তান সামরিক সরকার গণহত্যা বন্ধে ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্যতা তুলে ধরতে ১৯৭১ সালের ৫ জুন ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহকে মস্কো, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, অটোয়া ও ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্টের সাথে দেখা করে বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করেন। ১৭ জুন তিনি ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে এক বক্তৃতায় বলেন, 'বাংলাদেশের দুঃখজনক ঘটনা এই অঞ্চলের শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রতি বিপুল হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ... পাকিস্তানের সামরিক সরকারের কার্যকলাপ উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। তাই ভারত আশা করে যে, সমস্যার এমন একটি রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে যেটা পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য হবে।' (বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮৬, অনূদিত) ২২ জুন তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালের ১৩ মে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সে-সম্মেলনে ৮০টি দেশের মোট ৭০০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সে-সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অপরিহার্যতা তুলে ধরতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্দিষ্ট একটি বার্তা দিয়ে ভারতের প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের পর পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা এবং অন্যান্য অভিযোগে ১১ আগস্ট থেকে সামরিক আদালতে বিচারকার্য শুরু করার ঘোষণা দেন। এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১০ আগস্ট জাতিসংঘের মহাসচিবসহ ২৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট একটি বিশেষ বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির পক্ষে ভূমিকা গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। ১২ আগস্ট প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সংখ্যায় 'উথানট ও ২৪ দেশের নিকট ইন্দিরার আবেদন' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে লেখা হয়–

'নয়াদিল্লী হইতে রয়টার পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ব্যাপারে শান্তির স্বার্থে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর প্রভাব খাটানোর জন্য গতকাল ভারত জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথানট এবং ২৪টি দেশের সরকার-প্রধানদের নিকট আবেদন জানাইয়াছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট প্রেরিত একই ধরনের বাণীতে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দীরা গান্ধী বলেন, কোন বিদেশী আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়াই শেখ মুজিব গোপন বিচারের সম্মুখীন হইয়াছেন শুনিয়া ভারতের সরকার ও জনগণ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করিতেছেন।

তিনি বলেন যে, 'তাহারা (পাকিস্তান সরকার) মুজিবুর রহমান কোনো কিছু করিলে উহার পরিণতি অত্যন্ত মারাত্মক হইবে।'

১৯৭১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ভারত সরকারের অনুমোদনে আয়োজন করা হয় 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ'। তিন দিনের সেই বিশেষ সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের গণদাবি, ও পাকিস্তান সরকারের নৃশংসতা ও গণহত্যার ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরা হয় এবং সে-তথ্য বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পৌঁছে দিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের অনুরোধ জানানো হয়। সে-সম্মেলনে ২৪টি দেশের প্রায় ১৫০ জন রাষ্ট্রদূত অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ভারত সরকার প্রধান শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত সফরে যান। তিনি ২৮ সেপ্টেম্বর ক্রেমলিনে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ, পোদগর্নি ও কোসিগিনের সঙ্গে 'বাংলাদেশ' প্রশ্নে ছয় ঘণ্টা আলোচনা করেন। সেখানে তিনি পাকিস্তানের সামরিক সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণের মরণপণ যুদ্ধের বিবরণ তুলে ধরেন। এছাড়াও ১৯৭১ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বের ক্ষমতাবান ৮টি রাষ্ট্রে গমনের পরিকল্পনা মুক্তিযুদ্ধকে ভিন্ন মাত্রা প্রদান করে। এদিন তিনি ১৯ দিনের জন্য ভারত ছাড়েন এবং পরদিন ২৫ অক্টোবর বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস পৌঁছান। তিনি বেলজিয়ামের প্রধানমন্ত্রী গ্যাসটান আইসকেনসের আলোচনায় বসেন এবং পাকিস্তানের সামরিক শাসককে সাহায্য বন্ধ, সামরিক শাসকের গণহত্যায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীকে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনসহ অত্র অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগিতা চান। ২৮ অক্টোবর তিনি অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় পৌঁছান। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলর ড. ব্রুনো ক্রিসকির সাথে আলোচনা করেন। ড. ক্রিসকি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর শান্তি প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এ-ঘটনার পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৫ দিনের কর্মসূচি নিয়ে ৩১ অক্টোবর ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন পৌঁছান। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনের মাত্র ২৩ বছর পূর্বে ভারত-পাকিস্তান ব্রিটেনের শাসনাধীন ছিল। সুতরাং ভারত-পাকিস্তানের শান্তি-শৃংখলা ও এ-অঞ্চলের জন-উন্নয়ন প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লন্ডন ভ্রমণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি ভারত-পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা আনয়নে প্রধানমন্ত্রী অ্যাডওয়ার্ড হিথের সাথে গোপন বৈঠক করেন। ৩ নভেম্বর তিনি নিউ ইয়র্ক পৌঁছেন। ৪ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সাথে ১২৫ মিনিটের দীর্ঘ বৈঠক করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সে-বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সরকার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নৃশংসতা ও গণহত্যা বন্ধ এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী এক কোটি শরণার্থীর দুরবস্থার কথা তুলে ধরে সংকট দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। তবে পাকিস্তান অ্যামেরিকার মিত্র দেশ হওয়ায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন সে-বৈঠকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দাবির সাথে প্রত্যক্ষভাবে একমত হননি। তবে তিনি নৃশংসতা ও গণহত্যার ব্যাপারে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সংযত হতে বলবেন এবং একটা রাজনৈতিক সমাধানের পথ বের করার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। এ-বৈঠকের পর ৬ নভেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, 'এ-বছরের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক সরকার পূর্ব বাংলায় এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে। এখনো সেখানে গণহত্যা চলছে। ফলে এক কোটির অধিক বাঙালি সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ববাংলার মানুষ এখন স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার। ফলে তাদের স্বতন্ত্র

রাষ্ট্র গঠনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সামর্থ্য কারো নেই।' ৮ নভেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে যান। এ-দিনই তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদু এবং প্রধানমন্ত্রী চাবান দেলমাসের সঙ্গে বৈঠক করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসলীলার চিত্র তুলে ধরেন। সে-বিবরণ শ্রবণপূর্বক প্রেসিডেন্ট জর্জ পম্পিদু বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক শাসকের নৃশংস হামলাকে কল্পনাতীত বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'এ-সমস্যা কেবল কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না। আর পাকিস্তান এখন যে সমাধানের কথা বলছে, তা বাংলাদেশের মানুষের মতামত হলে ভারতের আপত্তি নেই। জনগণ যা চায়, তা-ই যেন করা হয়। জনগণের কাছে যা গ্রহণযোগ্য হবে, তা-ই যদি হয়, তবে আমরা সমাধান আশা করতে পারি।' ফ্রান্স সফর শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জার্মানির রাজধানী বনে যান। তিনি জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডটের সাথে বৈঠক করেন। সে বৈঠকেও তিনি পাকিস্তানের সামরিক শাসকের নৃশংস হামলার বিষয় তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারত সরকারের 'মৈত্রী চুক্তি' আন্তর্জাতিকমহলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যদিও এ-চুক্তির সূচনা-সম্ভাবনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তীকালেই প্রকাশমান হয়েছিল। মূলত ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পাকিস্তান সরকারের সাথে ভারত সরকারের বিরোধ দেখা দেয়। কাশ্মীর সংকট নিয়ে দেশবিভাগের মাত্র দুই মাসের মাথায় দুই দেশের মধ্যে প্রথম যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ১৯৬৫ সালে আবার দুই দেশের মধ্যে বড়ো ধরনের যুদ্ধ হয়। সে-যুদ্ধে পাকিস্তান চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করে। তবে সে-সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসেন তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট অ্যালেক্সি কোসিগিন। তাঁর উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধানে ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি রাশিয়ার তাসখন্দ শহরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির এক চুক্তি হয়–যে চুক্তি তাসখন্দ চুক্তি নামে খ্যাত। এই ঘটনার পর ভারত সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধ-সহযোগিতামূলক একটি চুক্তি করার প্রয়োজন অনুভব করে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় চীন ও যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে ভারত নিরাপত্তা-ঝুঁকিতে পড়ে যায় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তি করার প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে ১৯৭১ সালের ৯ আগস্ট দিল্লিতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় এ-চুক্তি সে সময় দক্ষিণ এশীয় ভূরাজনীতিতে একটি নিয়তি-নির্ধারক পদক্ষেপ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কেননা, এ-চুক্তিটির মূল কথা ছিল যে, ভারতকে তৃতীয় কোনো দেশ আক্রমণ করলে বা আক্রমণের হুমকি দিলে শান্তি আর নিরাপত্তার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ভারতের সাথে আলোচনা করবে। অর্থাৎ, ভারত আক্রান্ত হলে বা যুদ্ধের হুমকি পেলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।

এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর-পরবর্তীকালে ভারত অনেকখানি নিঃশঙ্ক হয় এবং তাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। কেননা, ভারত সরকার তখন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ হুমকি উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সশস্ত্র সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নিতে কার্পণ্য করেনি। ফলে, এ-চুক্তির বিপক্ষে পাকিস্তান সরকার বিষোদ্গার শুরু করে। পাকিস্তানের সামরিক সরকার এ-চুক্তিটিকে 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতীয় আগ্রাসনের ছাড়পত্র' হিসেবে আখ্যায়িত করে। তাছাড়া এ-চুক্তির কারণে পাকিস্তানের মিত্র দেশ চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হয়। মূলত এ-চুক্তির কারণেই ১৯৭১ সালের ৪ নভেম্বর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সাথে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ১২৫ মিনিটের দীর্ঘ বৈঠক সফল হয়নি। প্রেসিডেন্ট নিক্সন মুক্তিযুদ্ধকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার উল্লেখ করে পূর্ব পাকিস্তানের নৃশংসতা ও গণহত্যা বন্ধে কোনো প্রকার ভূমিকা গ্রহণ করেননি। বরং তিনি যুদ্ধ শুরুর পর থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মনে ভীতি-আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সহায়তা অব্যাহত রাখেন এবং যুদ্ধের শেষ দিকে

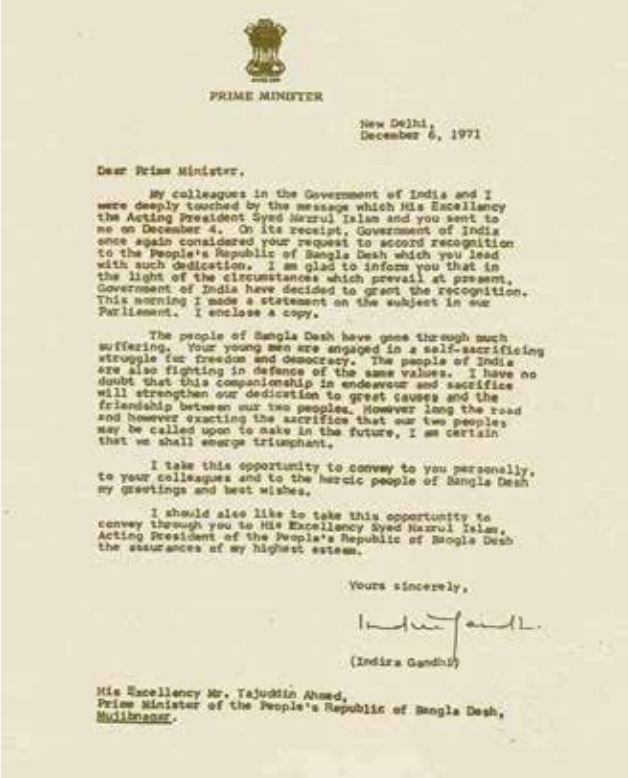

PRIME MINISTER

New Delhi,
December 6, 1971

Dear Prime Minister,

My colleagues in the Government of India and I were deeply touched by the message which His Excellency the Acting President Syed Nazrul Islam and you sent to me on December 4. On its receipt, Government of India once again considered your request to accord recognition to the People's Republic of Bangla Desh which you lead with such dedication. I am glad to inform you that in the light of the circumstances which prevail at present, Government of India have decided to grant the recognition. This morning I made a statement on the subject in our Parliament. I enclose a copy.

The people of Bangla Desh have gone through much suffering. Your young men are engaged in a self-sacrificing struggle for freedom and democracy. The people of India are also fighting in defence of the same values. I have no doubt that this companionship in endeavour and sacrifice will strengthen our dedication to great causes and the friendship between our two peoples. However long the road and however exacting the sacrifice that our two peoples may be called upon to make in the future, I am certain that we shall emerge triumphant.

I take this opportunity to convey to you personally, to your colleagues and to the heroic people of Bangla Desh my greetings and best wishes.

I should also like to take this opportunity to convey through you to His Excellency Syed Nazrul Islam, Acting President of the People's Republic of Bangla Desh the assurances of my highest esteem.

Yours sincerely,

(Indira Gandhi)

His Excellency Mr. Tajuddin Ahmed,
Prime Minister of the People's Republic of Bangla Desh,
Mujibnagar.

ভারত প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি পত্র

পাকিস্তানকে নিশ্চিত পরাজয় থেকে রক্ষা করতে ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি সপ্তম নৌবহর 'ইউএসএস এন্টারপ্রাইজ'কে বঙ্গোপসাগরে মোতায়ন করেন। এ-ঘটনায় অত্র অঞ্চলে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের হুমকি দেখা দেয়। ফলে উদ্বিগ্ন ভারত সরকার বিষয়টি সোভিয়েত ইউনিয়নকে অবহিত করে। পরবর্তীকালে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির শর্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের হুমকির জবাব হিসেবে ৬ ও ১৩ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন নিউক্লিয়ার মিসাইলবাহী দুটি ডুবোজাহাজ ভ্লাডিভোস্টক থেকে বঙ্গোপসাগরে প্রেরণ করে। এ-ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সপ্তম নৌবহর নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। যে-যুদ্ধের প্রধান সহযোগী দেশ ভারত। মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকার, মুক্তিবাহিনী, মুজিব বাহিনীসহ বিভিন্ন বাহিনী গঠনে প্রত্যক্ষ সহযোগিতা, আক্রমণের রোড ম্যাপ তৈরিতে অতুলনীয় অবদান রেখেছে ভারত সরকার। বিশেষ করে, ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে ভারত সরকারের যৌথবাহিনী গঠন এবং সম্মিলিত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত করেছে। তাই কালপুরুষ আবুল ফজলের নিম্নলিখিত অতুলনীয় বাক্যসমূহ উদ্ধৃত করে এ-নিবন্ধটি শেষ করতে হচ্ছে–'আমাদের স্বাধীনতার জন্য আমরা বাংলাদেশের বাইরে কারো কাছে যদি এককভাবে ঋণী হয়ে থাকি, তাহলে তিনি হচ্ছেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। এ দুঃসাহসী ও দূরদর্শিনী মহিলার সার্বিক সহযোগিতা ও হস্তক্ষেপ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতা শুধু যে বিলম্বিত হতো তা নয়, বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ-দুর্গতিরও সীমা থাকত না। মাত্র ন' মাসে যে আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি তার প্রধান কারণ ভারতের হস্তক্ষেপ। সে হস্তক্ষেপ মানে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। এ যুগের বিশ্ব-ইতিহাসের এক অসামান্য নারী।' (শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি, আগামী-সংস্করণ, ১৯৯৭,পৃষ্ঠা–১০)। •

হাসানুর রশীদ
কবি, ঔপন্যাসিক ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষক

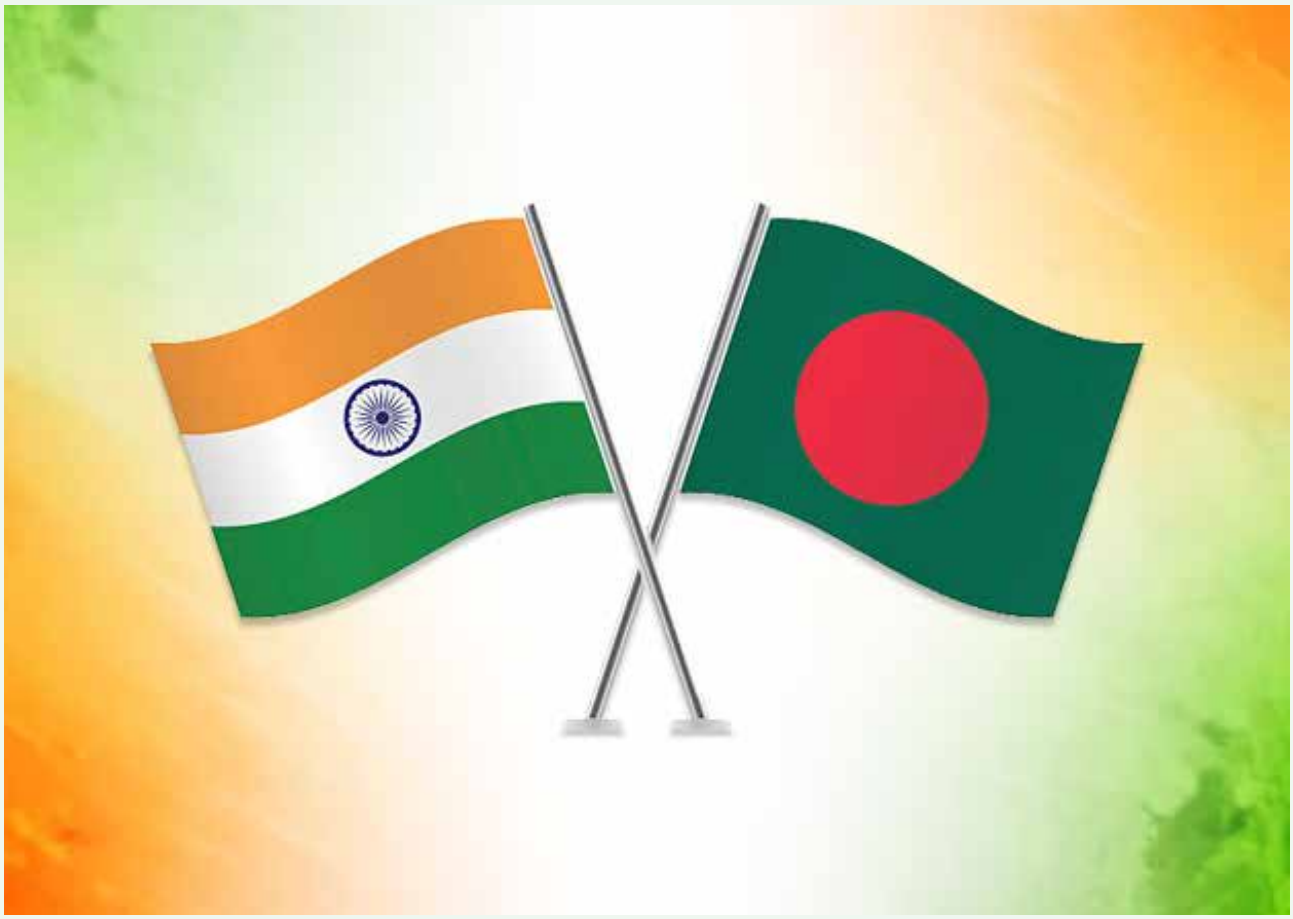

মৈত্রী

সৌহার্দের স্মারক
ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দিবস

দীপংকর গৌতম

১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে ভারত পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের কাঁটাতার আর পাসপোর্ট চালু হলেও বাংলাদেশের শিক্ষিত বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলো তখনো পড়ালেখা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি সবই করত ভারতে। দেশভাগের পর এদশের অজস্র মানুষ ভারতে চলে যায়, ভারত থেকে অনেক মানুষ এখানে আসে। বিষয়টা দাঁড়িয়েছিল এই যে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্তান, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। বাংলাদেশের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের আগে থাকতে যাতায়াতের কারণে খুব বেশি সংকট না হলেও ভারতের মুসলিমদের ব্যাপক সংকটে পড়তে হয়

যেমন সংকটে পড়তে হয়েছিল পাকিস্তানের (পশ্চিম) হিন্দুদের। যাইহোক দেশভাগের পর থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে দাবিয়ে রাখার সর্বোচ্চ অবস্থা নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাষার প্রশ্নেও উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকারের যাত্রা শুরু হয়। সর্বশেষ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগড়িষ্ঠতা পেলেও ক্ষমতা হস্তান্তর তারা করতেই চাইছিল না। আলোচনার নামে সময় ক্ষেপন করছিল আর সৈন্য আনছিলো তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে। তারা বাংলাদেশে গণহত্যার অংক কষছিল যখন ভুট্টো-মুজিব বা ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা চলছে।

ঢাকায় তখন চলছে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক। আলোচনায় অংশ নিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোও রয়েছেন শহরে। সব মিলে খুবই উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। তার আগে ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে এক সেনা সমাবেশে বলেন, কিল থ্রি মিলিয়ন অব দেম অ্যান্ড দ্য রেস্ট উইল ইট আউট অব আওয়ার হ্যান্ড। অর্থাৎ গণহত্যার প্ল্যান তারা করে এসেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা অপারেশন সার্চ লাইটের পরিকল্পনাও করে ফেলেছিলো। তাদের পরিকল্পনায় অপারেশন সার্চলাইটের, যুক্তি ছিল রাজনৈতিক সমঝোতা 'ব্যর্থ' হলে সামরিক অভিযান চালিয়ে 'পাকিস্তান সরকারের কর্তৃত্ব' প্রতিষ্ঠা করা হবে। 'কালরাত্রির' সেই ভয়াবহ সেনা অভিযানের পরিকল্পনা কীভাবে হয় তার ধারণা পাওয়া যায় সেসময় ঢাকায় দায়িত্বরত পাকিস্তানের অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের স্মৃতিকথা

থেকে। মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজা তখন পূর্ব পাকিস্তানের ১৪তম ডিভিশনের জিওসি ছিলেন। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে সামরিক অভিযানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী তিনি। 'আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই ঔন কান্ট্রি ইস্ট পাকিস্তান, ১৯৬৯-১৯৭১' শিরোনামের একটি স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ মার্চ রাতে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান টেলিফোনে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং মেজর জেনারেল খাদিম হুসাইন রাজাকে কমান্ড হাউজে ডেকে পাঠান। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান গভর্নরের উপদেষ্টা। দুইজন সেখানে যাওয়ার পর টিক্কা খান তাদের বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আলোচনায় 'প্রত্যাশিত অগ্রগতি' হচ্ছে না। যে কারণে এখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান 'মিলিটারি অ্যাকশনে'র জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। আর সে কারণে তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি সামরিক পরিকল্পনা তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে অনুযায়ী ১৮ মার্চ সকাল থেকে ক্যান্টনমেন্টে খাদিম হুসাইন রাজার বাসায় রাও ফরমান আলী এবং তিনি দুইজন মিলে অপারেশন সার্চলাইটের খসড়া তৈরি করেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালানোর পর পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে প্রায় এক কোটি শরণার্থী সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অবস্থান নেয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই ভারত পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে জড়িয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যেই ভারতের স্বীকৃতি চেয়ে চিঠি দেন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। কিন্তু কৌশলগত কারণে ভারত ছিল তখন সাবধানী। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে বসেই পরিচালিত হতো। এতে ভারত সরকারের সর্বাত্মক সহায়তা ছিল। এছাড়া মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ভারতের মাটিতেই প্রশিক্ষণ নিয়েছে এবং ভারত তাদের অস্ত্র সরবরাহ করেছে। অন্যদিকে এক কোটি বাংলাদেশি শরণার্থীকে সহায়তা করেছে ভারত। পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বোঝানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জুন মাস থেকে বিভিন্ন দেশে সফর শুরু করেন। পাকিস্তানি বাহিনী কীভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে এবং এর ফলে ভারত কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সে বিষয়টি বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানের কাছে তুলে ধরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। প্রকৃতপক্ষে, সেসব সফরের মধ্য দিয়ে মিসেস গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপের ভিত্তি তৈরি করেন। ১৯৭১ সালের ২৪ মে ভারতের লোকসভায় এক বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, যে বিষয়টিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বর্ণনা করা হচ্ছে, সেটি ভারতেরও অভ্যন্তরীণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর সে ভাষণ ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ওয়েবসাইটে তুলে ধরা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া শরণার্থীদের কথা উল্লেখ করে মিসেস গান্ধী বলেন, ভারতের ভূমি ব্যবহার করে এবং ভারতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে পাকিস্তান তাঁর সমস্যা সমাধান করতে পারে না। এটা হতে দেওয়া যায় না। ১৯৭১ সালের মাঝামাঝি বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, সীমান্তে পাকিস্তানের সাথে সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের সাথে হোয়াইট হাউজে বৈঠক করেন ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে ভারতের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। একদিকে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া এক কোটি শরণার্থীর চাপ, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতি–এ দুটো কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। ভারত যেকোনো সময় পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে পারে–পাকিস্তান সরকারের মনে এই আশঙ্কা বরাবরই ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের অন্যতম উপদেষ্টা জি.ডব্লিউ চৌধুরীর মতে জুলাই মাসেই পাকিস্তান সরকার জানতে পারে যে ভারত সামরিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে রাশিয়ার সাথে একটি মৈত্রী চুক্তি করে ভারত। এই বিষয়টি ভীষণ চিন্তায় ফেলে আমেরিকাকে। তখন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এই মৈত্রী চুক্তিকে 'বোম্বশেল' হিসেবে বর্ণনা করেন। পাকিস্তানের সাথে ভারতের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন চুক্তিকে দায়ী করেন মি. কিসিঞ্জার। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণের পর যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে যায় ভারত। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে দেওয়া এক বিবৃতির মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন। এর কয়েকদিন পরে, অর্থাৎ ৮ ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এক রেডিও ভাষণে বলেন, 'আমাদের যোদ্ধারা এখন ভারতীয় সেনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করছে এবং তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে আমাদের মাটিতে বইছে।' সে ভাষণে তাজউদ্দীন আহমেদ ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ভারত যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে যাবার পরে মিত্র বাহিনী গঠন করা হয়। ভারতীয়রা যুদ্ধে জড়িয়ে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই যশোর, খুলনা, নোয়াখালী অতিদ্রুত ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পাকিস্তানি বাহিনীর পরাজয় তখন শুধুই সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিবাহিনী ও বন্ধুদেশ ভারতের মিত্র বাহিনীর যৌথ অবস্থানের মধ্য দিয়ে পরাজয় ঘটে পাকিস্তানের। জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামের নতুন রাষ্ট্র। ভারতের স্বীকৃতির সেই দিনটি বাঙালিরা মৈত্রী দিবস হিসেবে পালন করে। পার্শ্ববর্তী দুদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থানের এ এক স্মারক বলা যায়।

দুই.

বাংলাদেশ ও ভারত দক্ষিণ এশিয়ার দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র হলেও এই দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। মুক্তিযুদ্ধেও আতঙ্কিত প্রহরবেষ্টিত নয়মাসে ভারত বাংলাদেশের প্রায় ১ কোটি পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীকে আশ্রয় দেয় এবং সামরিক সহায়তা প্রদান করে। শুধু তাই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যে ভূমিকা রেখেছিলেন সেটা অনস্বীকার্য। তার সৌহার্দপূর্ণ সাহসী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের জন্ম ও স্বাধীনতা অর্জনকে গতিময়তা দিয়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে দুদেশের সম্পর্ক বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছেছে। বিশেষত দীর্ঘ দিনের ছিটমহল সংকট নিরসন, অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে দুদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। এছাড়াও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য যে বৃত্তি চালু করেছে ভারত তা দুদেশের সম্পর্কের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দুদেশের আন্তঃদেশীয় সড়ক যোগাযোগ চালু করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই যোগাযোগের কারণে দুদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ব্যাপক রূপ নিয়েছে। আন্তঃদেশীয় সড়ক যোগাযোগকে বাঁকা চোখে দেখার লোকও রয়েছেন। তাদের ধারণা তাদের যুক্তি, বাংলাদেশ তাহলে ভারতের করিডর হয়ে যাবে। এই ধরনের যুক্তি সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং পাকিস্তানপন্থি যে ধারাটি বাংলাদেশে রাজনীতিতে সক্রিয় তাদের। কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের এ যুগে এই ধরনের উদ্যোগ সার্থক হলে দুই দেশের জন্যই সুফল বয়ে আনবে। এই যোগাযোগের সঙ্গে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য এবং ভিসামুক্ত ভ্রমণ সুবিধা প্রদান করা হলে উভয় দেশ যেমন লাভবান হবে, একইসঙ্গে দুইদেশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে। যেমনটি ইউরোপে দেখা যায়, সেনজেন ভিসার আওতায় ইউরোপের অনেক দেশে প্রবেশ করা যায়।

ভারত-বাংলাদেশ বিভিন্ন ইস্যুতে অসাধারণ সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বণ্টন চুক্তি, ছিটমহল সমস্যার সমাধান এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর জন্য পণ্যের শুল্কমুক্ত সুবিধা, সীমান্ত হত্যা বন্ধে যুগান্তকারী সব সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এতটা মজবুত ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে অনেক দেশেরই গায়ে জ্বালা এটাও ঠিক। এরমধ্যেও সব বিষয়ে এখনো ঐক্যমতে পৌঁছানো না গেলেও আলোচনার মধ্য দিয়ে সব সংকট নিরসন সম্ভব। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে যা দৃঢ়তা দান করবে এবং দেশের উন্নয়নকে করবে গতিশীল। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী দিবসের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়াই হবে দুদেশের মূল লক্ষ্য। •

দীপংকর গৌতম
কবি, সাংবাদিক ও গবেষক

বিশ্বমানব অতীশ দিপংকর

সালেহা চৌধুরী

প্রবন্ধ

বাঙালি সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই বড় জোর শতবার্ষিকী উৎসব পালন করি। কিন্তু মহত্তম বাঙালির মধ্যে যিনি সম্ভবত ছিলেন প্রথম বিশ্বমানব (ইউনিভার্সাল ম্যান), তাঁর সহস্র বার্ষিকী আমরা স্মরণে রাখিনি। সৌম্যকান্ত এক বাঙালি পণ্ডিত চলেছেন বিজয় অভিযানে। বয়স ষাট কিন্তু মুখ প্রসন্ন হাসিভরা। শ্রীমুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে সংস্কৃত মন্ত্ররাজি। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে তিনি তাঁর মাতৃভাষায় বলে উঠছেন অতি ভালো, অতি ভালো, অতি মঙ্গল, অতি ভালো হোক। রাজহংসের মতো সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলেছে তার অশ্ব, সঙ্গে চলেছেন পঁয়ত্রিশ জন সন্ন্যাসী। গন্তব্যস্থল খোলিন, তিব্বত রাজ্যের আবাসস্থল। ধর্ম বিহার। পার্শ্বচর ও দেহরক্ষি হিসেবে চলেছে তিনশ জন অশ্বারোহী। তাদের অধিনায়ক চারজন সেনাপতি

তাদের মধ্যে প্রধান যিনি তিনি সম্মান দেখিয়ে সম্বোধন করছেন–হে পরম বিদগ্ধ গুণী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, আপনি সমগ্র তিব্বতের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে দেবতার প্রতিকৃতি রূপে ভারত থেকে এসেছেন। আমাদের প্রতি আপনার মহাকরুণা। আপনি 'চিন্তামণি।' সত্যই চিন্তামনি এই বিজয়ী সাধু পণ্ডিত। বাহুবলে নয়, পার্থিব সম্পদে নয়, বিদ্যায় ধর্ম প্রচারে তিনি তিব্বত জয় করেছিলেন। পথে তাঁর জয়গাঁথা গাওয়া হলো–এই যুগে আপনি বুদ্ধের প্রতিভূ ও বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা। আপনি বিশ্বসংসারের প্রশংসাভাজন। আপনার পবিত্রতা আপনাকে সব জীবিত প্রাণময় দেবতার নমস্য করেছে। এই সাধু পণ্ডিতই অতীশ দিপংকর।

এবার তাহলে জানতে হয় কে এই অতীশ দিপংকর যাকে ১৯৩১, ৯ই জুলাইয়ের 'টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় 'ইউনিভার্সাল ম্যান' বলে সম্বোধিত করা হয়। অতীশ তখনো সহস্র বৎসর পার হ'ননি কিন্তু তাকে সম্মান দেখিয়ে সেইসময় একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং সেখানে তাঁর কীর্তির কথা বলা হয়। দেবেশ দাশ তাঁর 'বৃহত্তর বাঙালি' গ্রন্থে অতীশ দিপংকর নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনা করেন। যে আলোচনার উৎসমুখ ছিলো এই 'টাইমস' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাটি। তাঁর জীবন জানতে বাংলা কালচার ডিস্কনারি নামে একটি ওয়েব সাইটে তার পরিচয় পেলাম এই ভাবে। অতীশ দিপংকর, শ্রী জ্ঞান ৯৮২–১০৫৩। দেবেশ দাসের সঙ্গে এখানে পার্থক্য দেখা গেল।

তাঁর মতে অতীশ দিপংকরের জন্ম ৯৮০ সালে। ওয়েব সাইট অতীশকে এই ভাবে বর্ণনা করেছে। জন্মগ্রহণ করেছেন বিক্রমপুরের বজ্রযোগীনি গ্রাম ঢাকায়। একজন লেখক এবং পণ্ডিত। বাবা-মা তাঁর নামকরণ করেছিলেন আদিনাথ চন্দ্র গারভা। উনিশ বছর বয়সে তিনি বৌদ্ধধর্মে দিক্ষিত হ'ন। তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মে দিক্ষিত করেছিলেন মহাসংখ্যাচারিয়া শ্রীলরক্ষিতা। এবং তাঁর নাম বদলে তাঁকে একটি নতুন নাম দিয়েছিলেন, নামটি হলো দীপংকর শ্রী জ্ঞান। জানা যায় জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন মায়ের কাছ থেকে। তারপর অবধূত জাত্রেয়ী তাঁকে ধর্মবিজ্ঞানে শিক্ষা দেন। আর বৌদ্ধ ধর্ম জানতে তাঁকে আলোকিত করেন বিহারের কৃষ্ণ গিরি রাহুল। এবং তাকে 'গুহ্য জ্ঞানতন্ত্র' টাইটেল দান করা হয়। জ্ঞান অর্জনে ও বিস্তারে প্রথমে তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (শ্রীলংকা) আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলো অনুগত একশো জন শিষ্য। বাড়িতে ফিরে আসার আগে সেখানে তিনি বারোবছর ধরে বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে গভীর পড়াশুনা করেন। সেই সময় বঙ্গদেশ শাসন করতেন রাজা মহিপাল। মহিপালের অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য নিযুক্ত হ'ন।

তিব্বতের রাজা যখন অনেক উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁকে তিব্বতে গিয়ে ধর্ম প্রচারের জন্য আহ্বান করেন, তিনি সেখানে যেতে অস্বীকার করেন। রাজা লামা মারা গেলে এর পরের রাজা জ্ঞানপ্রভা তাঁকে আবার আহ্বান করেন। তিনি অনেক কষ্ট করে, দুর্গম গিরি প্রান্তর মরু পার হয়ে ১০৪১ সালে তিব্বতে আসেন। আর তিব্বতে যাওয়ার পথে নেপালের রাজা অনন্ত কীর্তি তাকে বিশাল এক সংবর্ধনা দেন। তৎকালীন নেপালের রাজার নাম ছিলো অনন্তকীর্তি। আর সেইসময় যুবরাজ পথপ্রভা নিজে বৌদ্ধধর্মে দিক্ষিত হন। এখনো সেখানে সেই সংবর্ধনার চিহ্ন বর্তমান।

তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্ম, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং। অনেক বই লেখা হয় তিব্বতি ভাষায়। তখনই তাকে এই সম্মানিত খেতাব দেওয়া হয় 'অতীশ।' যেখানে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরও অনেক আগে তিনি কিছু দুর্লভ পুথি পান যা ভারতীয় পদকর্তার ও মনীষীর সৃষ্টি বলে তার ধারণা। অবশ্য সেগুলো লেখা হয়েছিলো সংস্কৃতে। সেই বইগুলোর কপি করে তিনি সেগুলোকে বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থকে ভুটানের ভাষায় অনুবাদ করেন। এ ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন 'প্রদীপ পঞ্চিকা', 'বুধীপথ প্রদীপ', 'রত্নকরণদৌতঘাট'। এ ছাড়া সম্রাট নয়পালকে লেখা অসংখ্য চিঠিপত্র। যে গ্রন্থের নাম 'বিমল রত্ন লেখ।' তিনি যেগুলো সংস্কৃত ভাষায় লিখেছিলেন তা ধবংস হয়ে গেছে কিন্তু যা তিব্বতিতে লিখেছিলেন তা এখনো আছে।

সেইসময় তিব্বতে একটি বড় বন্যা হয়। তাঁকে যে টাকা পয়সা দিয়েছিলেন তিব্বতের রাজা ও প্রজা সবকিছুই তিনি ব্যয় করেন সেই নদীর বাঁধ নির্মাণে। এবং বাঁধ কী ভাবে করতে হবে সে চিন্তাও তাঁর মস্তিষ্ক থেকে এসেছিলো। সম্রাট নয়পাল ও সম্রাট কর্নের মধ্যে যে দীর্ঘদিনের বিবাদ তা তাঁর মধ্যস্ততায় শেষ হয়।

তিব্বতে তাঁকে পয়গম্বরের মতো পূজা করা হয়ে থাকে। বলা হয় অবতার। সেখানে তিনি সতেরো বছর ছিলেন এবং বাহাত্তর বছর বয়সে তিনি মারা গেলে তাঁকে সেখানকার রাজধানীর পাশে সমাধিস্ত করা হয়।

অতিতের ইতিহাস নিয়ে যারা গর্ব করতে চান তাদের জন্য নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বড় গর্বের ব্যাপার। অতীশ দিপংকর এই নালান্দাতে অধ্যাপনা করেন। যদিও চর্যাচর্য বিনিশ্চয় নিয়ে তিনি গবেষণা করেননি কিন্তু এখন জানা যায় চর্যাপদের দুই বিশেষ পদকর্তা ভুসুকু পাদ ও লুইপাদ তাঁর শিষ্য ছিলেন। গঙ্গারিদ নামে যে দেশটি দেখে আলেকজান্ডার দি গ্রেট ভয় পেয়েছিলেন সে যে এই বঙ্গদেশ সে বিষয়ে অনেকেই একমত। গঙ্গা মানে নদী আর রিদ মানে অনেক। কাজেই যে দেশে অনেক নদী আছে সে দেশ তো বাঙলাদেশই হতে পারে। আর সেই বাঙলাদেশের প্রথম বিশ্বনাগরিক হিসেবে অতীশকে চিহ্নিত করেন অনেক পশ্চিমের জ্ঞানী মানুষ। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলেন 'লুইপাদের সময় ঠিক করিতে চাহিলে বলিতে হইবে যে তাহার একখানি গ্রন্থ রচনায় দীপঙ্কর শ্রী জ্ঞান সাহায্য করিয়াছিলো। সে গ্রন্থখানির নাম "অভিসময় বিহঙ্গ।" কাজেই চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে তিনি যদি সাহায্য করে থাকেন তা মেনে নিতে অসুবিধা নেই। এবং তিনি 'চর্যাসংগ্রহ প্রদীপ' রচনা করেছিলেন সে বিষয়ে সকলে একমত। আর আমরা জানি এই চর্যা বাংলা কবিতা।

তাঁর তিব্বতে গমনের ফলে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা সমৃদ্ধ হয় এবং অশিক্ষিত ও ভ্রান্ত লামারা নতুন আলোক পায়। মহাযান পন্থার মাধ্যমে তিনি সর্বজনীন বিশ্বজনীন মুক্তির উপাসক হয়েছিলেন। মাক্স মুলারও অতীশের জ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারেননি। মহাযান বৌদ্ধধর্মে মঞ্জুশ্রীকে ধর্মের স্বর্গীয় রক্ষক বলে মনে করা হয়। পণ্ডিত ইভানস ওয়েনস অতীশ দিপংকরকে সেই মঞ্জুশ্রীর অবতার বলে স্বীকার করেন। আর সকলেই এ কথা মেনে নিয়েছিলেন অতীশ দিপংকর নিরাপদ জায়গায় বসে যে জ্ঞান চর্চা করবেন তা সকল মানুষের কাজে লাগবে। নেপাল, ভুটান ও তিব্বতে যে সব পণ্ডিত সে সময় থেকে যেতেন তার নাম ছিলো বঙ্গাল। গর্বের কথাই বটে। সেই বঙ্গাল আজ আমাদের দেশ। মিস্টার এ ওয়াডেল তাঁর গ্রন্থ 'বুদ্ধিইজম অফ টিবেট অর লামাইজমে' অতীশ দিপংকরের কথা বলতে গিয়ে যে জন্ম তারিখ দিয়েছেন তাতে ৯৮০ লেখা আছে। কাজেই ১৯৮০ সালে অতীশ দিপংকরের সহস্র জন্মবার্ষিকী চলে গেছে। এখন তাঁর নামে যে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে তার যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করা হয়েছে, এ কথা বলতেই হবে। প্রথম বিশ্বমানব, একজন যোগ্য চিকিৎসাবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার! এমন সম্মান তিনি না পেলে আর কে পাবেন। যিনি বিশ্বাস করতেন মানুষই চেষ্টা করলে মননে ও মানসে নিজেকে সর্বোচ্চ জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, ঈশ্বরের ভয়েই কেবল নয়।

মহাযান অর্থ মহান যে যান। যে যানবাহন আমাদের জীবনের জন্য মহান। যা আমাদের শুদ্ধ করে, মানবিক করে ও পরিশীলিত করে। অতীশ সেই যানবাহন নিয়েই কারবার করলেন। হীনযান যখন কেবল ধর্মের আচার নিয়ে ব্যস্ত হয় তখনই তা হয়ে যায় এমন এক যানবাহন যাকে হীন বলে আখ্যায়িত করেন মহাযানের সাধক। হীনযানে এলো গভীরতর দর্শন। আধুনিক মানুষের দর্শন। আচারের মরুবালুরাশিতে তিব্বত যখন হারিয়ে ফেলেছে বৌদ্ধ ধর্মের সকল সৌন্দর্য তখনই ডাক পড়েছিলো তার। হীনযান–আচার সর্বস্বতা, মহাযান–এর দার্শনিকতা ঠিকমতো বুঝতে পারা, তন্ত্রযান–এর রহস্য বোঝার কথা, যে রহস্য বুঝতে পারা যায় নানাপ্রকার তন্ত্র ও নিয়মরীতির ভেতর দিয়ে। অতীশ আমাদের জীবনের এই তিনটি দিককে চিহ্নিত করে এর দর্শনের ওপর অধিক জোর দিলেন। আর মহাযানের একটি শাখা জেনবৌদ্ধবাদ নাম নিয়ে জাপানে প্রাধান্য পেল। এখন এই পৃথিবীতে সবচাইতে জনপ্রিয় ও ক্রমবর্ধমান ধর্ম বৌদ্ধবাদ। অতীশ বুঝেছিলেন সারা বিশ্ব একদিন বুঝবে এর আসল সৌন্দর্য।

কারণ মানুষ একদিন শুদ্ধতম হতে পারে, নির্বাণ লাভ করতে পারে কেবল নিজের কারণে ও নিজের অন্তরস্থিত প্রদীপে।

একবার ডালাইলামাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল–আচ্ছা ধ্যান বা মেডিটেশন কি ঈশ্বরের জন্য প্রয়োজনীয়? উত্তরে বলেছিলেন তিনি–না এ তোমার নিজের জন্য প্রয়োজনীয়। কারণ এর ফলে নিজের বিক্ষিপ্ত মনকে গোছাতে গোছাতে একদিন তুমি শুদ্ধতম মানুষে পরিণত হবে। অতীশ দিপঙ্করও বারবার সেই কথাই বলেছিলেন। শুদ্ধতম মানুষ হয়ে উঠবার যানবাহন তোমার নিজের কাছে। এই মহাযানে উঠে মানুষ একদিন শুদ্ধ হয়ে অনন্তে মিশে যাবে। বারবার এই গ্লানিময় পৃথিবীতে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না। নির্বাণ লাভ কেবল নয়, শুদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকা।

অনেকে মনে করেন এক রাতে তিনি গৌতম বুদ্ধকে স্বপ্নে দেখেছিলেন। তারপর তিনি বৌদ্ধ হয়ে যান। বজ্রযোগীনিতে তাঁর বড় একটি স্মৃতিফলক করেছেন বাংলাদেশ সরকার। কেমন করে একজন প্রিন্স হয়েছিলেন তান্ত্রিক এবং তারপর বৌদ্ধ ধর্মের সাধক। মহাযান ছিল তাঁর সেই যানবাহন যে বাহন তাঁকে করেছিল মহাজ্ঞানী। জ্ঞান আহরণের অনন্ত পিপাসা তাঁকে বারবার জ্ঞানের খোঁজে এখান থেকে ওখানে নিয়ে যায়। আশ্চর্য! তিনি একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন।

সালেহা চৌধুরী
কথাসাহিত্যিক ও অনুবাদক।

তথ্যসূত্র –১ কোলিয়ার্স এনসাইক্লোপেডিয়া ২ বৃহত্তর বাঙালি –দেবেশ দাশ ৩ ওয়াডেল এ –বুদ্ধিইজম অফ টিবেট অর লামাইজম ৪ দি টাইমস – তারিখ ৯.৭.৩১ ৫ বাংলা কালচার ডিক্সনারি অব বায়োগ্রাফি ওয়েবসাইট। •

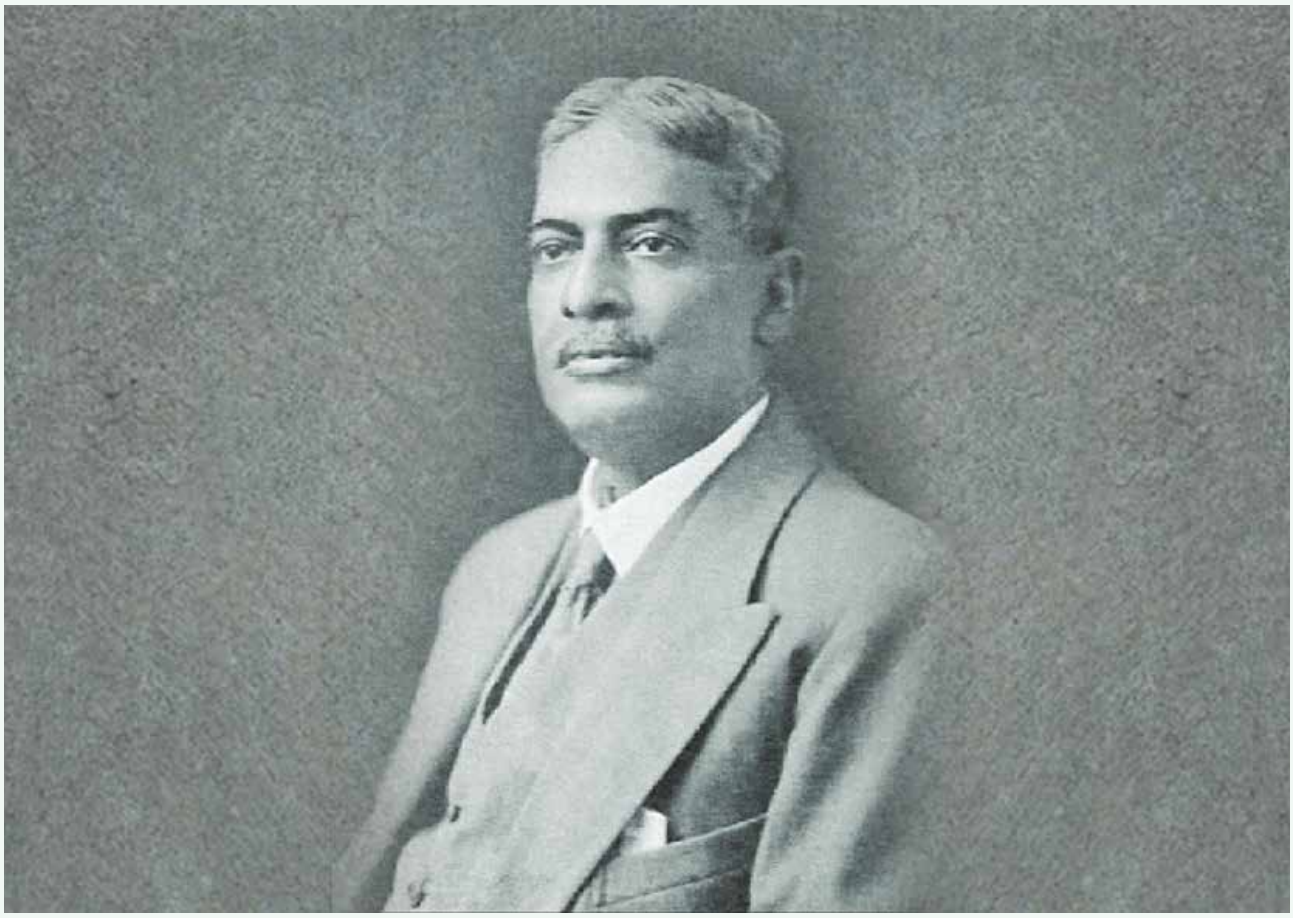

শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

তপন চক্রবর্তী

সার্ধশত জন্মবর্ষ

ছোটবেলা থেকে কালাজ্বরের একমাত্র ওষুধ ব্রহ্মচারী ইঞ্জেকশনের নাম শুনে আসছি। এই ওষুধের আবিষ্কর্তা ইউ. এন ব্রহ্মচারীর (উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী) নামও শুনেছি। তিনি তাঁর সময়ে অগ্রগণ্য চিকিৎসাবিদ ও বিজ্ঞানী। জানা যায়, রায় বাহাদুর স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, এফআরএসএম, এফআরএস-এর ১৯২২ সালে আবিষ্কৃত ইউরিয়া স্টিবামাইন (কারবোস্টিবামাইড) ভারতের বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, অসমসহ অন্যান্য রাজ্যে এবং চীন, গ্রিস, ফ্রান্স, ইটালিসহ এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহুদেশের লাখ লাখ মানুষের জীবনকে রক্ষা করেছে। এই ওষুধ আবিষ্কারের মাত্র ১০ দিন আগে উপেন্দ্রকিশোর রায় মারণব্যাধি কালা-জ্বরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এক সময় বাংলায় কালাজ্বর শব্দটির সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় উচ্চারিত হতো ইউরিয়া স্টিবামাউন বা ব্রহ্মচারী ইঞ্জেকশন। ১৯২৯ দুবার এবং ১৯৪২ সালে পাঁচবার শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদানের জন্য ব্রহ্মচারীর নাম সুপারিশ করা হয়েছিল

ম্যালেরিয়ার উৎস আবিষ্কারক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রস পরজীবীর নাম রাখেন লেইশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি *Leishmania donovani*। এই পরজীবীর বাহক হলো স্যান্ড ফ্লাই। এটি মশার আকারের এক চতুর্থাংশ। দেহের রং লাল, বাদামি বা ধূসর। এর উৎসস্থল খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। সাধারণত অরণ্যাঞ্চলের উষ্ণ আবহাওয়ায় এরা জন্মায়

এই মাপের প্রাতঃস্মরণীয় মানুষটি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে প্রায় অচেনা হয়ে উঠেছেন। এই গুণিগণ তো তাদের এগিয়ে চলায় বাতিঘর। ভারতের বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর কাছে সারডাঙ্গা গ্রামে ১৮৭৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর উপেন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। বাবা নীলমণি ব্রহ্মচারী ভারতীয় পূর্ব রেলওয়ের একজন চিকিৎসক ছিলেন। মার নাম সৌরভ সুন্দরী দেবী। তিনি ১৮৯৩ সালে পূর্ব রেলওয়ের জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কুল শিক্ষা সম্পন্ন করে হুগলি মহসিন কলেজ থেকে অংকশাস্ত্র ও রসায়নে স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৯৪ সালে রসায়নে স্নাতকোত্তর এবং ১৯০০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি পাশ করেন। মেডিসিন ও সার্জারিতে রেকর্ড সংখ্যক নম্বর পাওয়ার জন্য তাঁকে গুডইভ ও ম্যাক্লিয়ড *Goodeve and MacLeod* পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ডি ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন যথাক্রমে ১৯০২ ও ১৯০৪ সালে। তাঁর অভিসন্দর্ভের নাম ছিল 'স্টাডিজ ইন হিমোলাইসিস *(Studies in Haemolysis)*' অর্থাৎ লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে গেলে যে সব রোগ হয়, তা নিয়ে গবেষণা। অংকশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য তাঁকে থয়টস *Thwaytes Medal* পদকেও ভূষিত করা হয়।

তাঁর নাক্ষত্রিক শিক্ষাজীবন বিস্ময়কর। চিকিৎসাবিদ্যা ও রসায়নে অগাধ পাণ্ডিত্যের মেলবন্ধন ভিন্ন দিক থেকে তাঁকে কালাজ্বরের ওষুধ গবেষণায় প্রভূত সাহায্য করেছে। ব্রহ্মচারী ১৮৯৯ সালের সেপ্টেম্বরে রাজ্য মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান করেন। অল্প সময়ের জন্য চিকিৎসক স্যার জেরাল্ড বোমফোর্ডের ওয়ার্ডে হাউস ফিজিসিয়ান হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। বোমফোর্ড তরুণ বিজ্ঞানীর গবেষণার ঝোঁক ও কর্তব্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হন। তিনি ১৯০১ সালে উপেন্দ্রনাথকে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের শরীরতত্ত্ব ও মেটিরিয়া মেডিকার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন। এখানে তিনি চার বছর কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকায়ও শিক্ষক, চিকিৎসক ও উপদেষ্টা হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। এখানে তিনি স্কুলের সুপারিন্টেন্ড স্যার নেইল ক্যাম্পবেলের সঙ্গে গবেষণা করেন। ১৯০৫ সালে তাঁকে কোলকাতায় ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (বর্তমান নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) বদলি করা হলে তিনি মেডিসিনের প্রথম চিকিৎসক রূপে যোগদান করেন।

তাঁর কর্মজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ২০টি বছর তিনি ক্যাম্পবেলেই কাটান। ১৯২৩ সালে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিনের অতিরিক্ত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মচারী ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে. কে চাটার্জী ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের অধীন না হয়েও কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের (বর্তমান আর. জি. কর মেজিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল) ট্রপিক্যাল বা উষ্ণমণ্ডলীয় রোগসমূহের বিভাগে প্রফেসরের পদে যোগদান করেন। তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈবরসায়ন বিভাগের প্রধান এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজে সাম্মানিক প্রফেসর পদেও কাজ করেন। ১৯০৫ সালে ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে যোগদানের পর পরবর্তী দুই যুগ তিনি বিরামহীন গবেষণায় নিজেকে নিবেদিত করেন। গবেষণার বিষয়বস্তু মারণব্যাধি কালাজ্বর Kala-azar *visceral leishmaniasis*। এই রোগে মানুষের যকৃত, প্লীহা ও হাড়ের মজ্জা ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এই রোগ প্রথমে মুখমণ্ডলে গুটির মতো দেখা যেত। রোগী দুর্বল হয়ে যেত ও দেহের ওজন কমতে থাকত। পরে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ ধরা পড়ত। দেহের ত্বকের বর্ণ কালো হয়ে যেত এবং চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটলে অধিকাংশ রোগী মারা যেত।

কালাজ্বর-এর প্রথম লক্ষণ

ব্রিটিশ চিকিৎসকেরা ১৮৭০ সালে রোগটি শনাক্ত করেন এবং একে প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা চালান। এ সময় ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর অববাহিকায় লাখ লাখ লোক মারা যায়। ১৯০৩ সালে উইলিয়াম লেইশম্যান ও চার্লস ডোনোভ্যান কোলকাতা ও মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) সেনাদের রক্তে ময়নাতদন্ত *Autopsy* করে এই রোগসৃজক পরজীবীর সন্ধান পান। ম্যালেরিয়ার উৎস আবিষ্কারক নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী স্যার রোনাল্ড রস পরজীবীর নাম রাখেন লেইশম্যানিয়া ডোনোভ্যানি *Leishmania donovani*। এই পরজীবীর বাহক হলো স্যান্ড ফ্লাই। এটি মশার আকারের এক চতুর্থাংশ। দেহের রং লাল, বাদামি বা ধূসর। এর উৎসস্থল খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য। সাধারণত অরণ্যাঞ্চলের উষ্ণ আবহাওয়ায় এরা জন্মায়। স্যান্ড ফ্লাই মানুষের দেহ থেকে পরজীবীটাকে সংগ্রহ করে এবং তা আবার মানুষের দেহে সঞ্চালন করে। লেইশম্যানিয়া ডনোম্যানি মূলত লোহিত রক্তকণিকাকে ভেঙে নানা অপকাণ্ড করে।

স্যান্ড ফ্লাই

১৯১৩-১৯১৫ সালে কিছু কিছু রিপোর্টে জানা যায় যে ব্রাজিল ও ইটালিতে এই রোগীর রক্তে tartrate emetic *potassium salt of antimonyl tartrate* ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গিয়েছিল। তার এর মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে। ব্রহ্মচারী পটাশিয়াম লবণের পরিবর্তে সোডিয়াম লবণকে metallic antimony দিয়ে পরীক্ষা করেন। পরীক্ষার ফল উন্নততর, তবে অন্য সমস্যা দেখা দেয়। এই উপাদান সহজলভ্য নয় এবং তা দীর্ঘদিন গুদামজাত করে রাখা যায় না। এছাড়া এটি তৈরিতে ও প্রয়োগে সময় বেশি লাগে। আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রতিবন্ধকও ছিল। ব্রহ্মচারীর জন্য একটি ছোট কক্ষ বরাদ্দ হয়েছিল। কক্ষে জল সরবরাহ, বুনসেন বার্নার ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নূতন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কলেজে গবেষকের জন্য এতটি বড় পরিসরের কক্ষ বরাদ্দ করেছিলেন। পদার্থবিজ্ঞানে নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী পালিত প্রফেসর সি. ভি. রামন বাধা দেন এবং কক্ষটি অন্য এক প্রফেসরের এক্সরে স্পেক্টোগ্রাফি বসানোর জন্য বরাদ্দ করেন। অগত্যা গবেষককে অন্ধকার ছোট কুটুরিতে বসেই গবেষণা করতে হয়।

ব্রহ্মচারী ১৯২০ সালে একটি নূতন যৌগ উদ্ভাবন করেন। যৌগের নাম Urea Stibamine *the urea salt of p-stibanilic acid*। এটি প্রয়োগ করে মৃত্যুর হার শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, তখনো পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরজীবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অন্য কোনো অস্ত্রও ছিল না। এটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে তা পৃথিবীময় ব্যবহৃত হতে থাকে।

গবেষক এক পত্রে জানান, 'আমি শিয়ালদহের কোলকাতা ক্যাম্পবেল

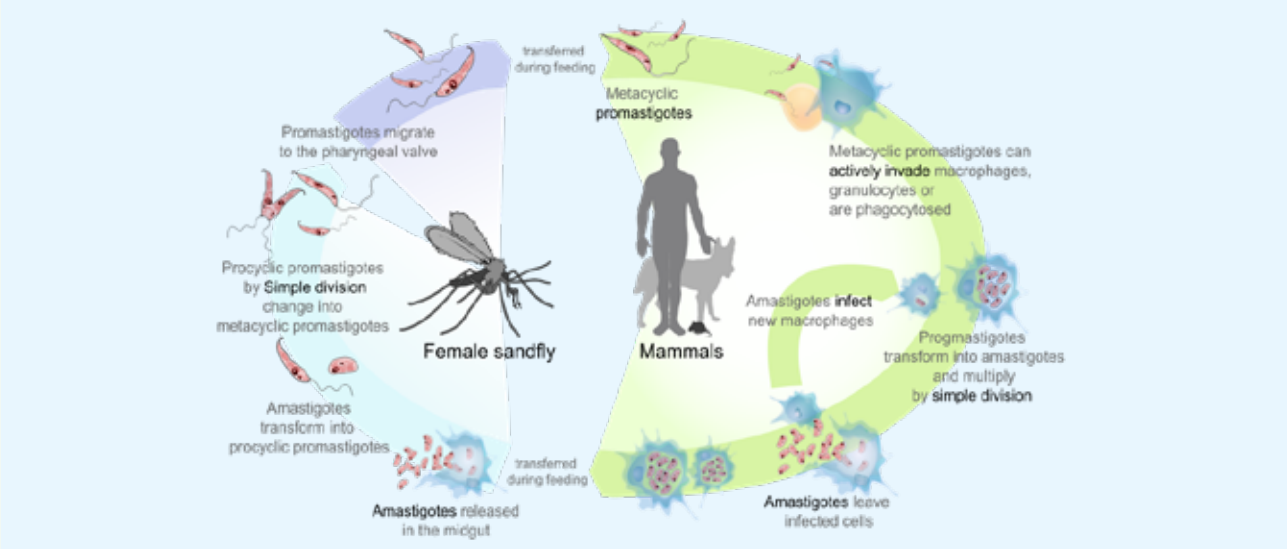

হাসপাতালের আমার স্মরণীয় সেই রাতটিকে মনে রাখি, যে রাতে আমার কঠিন পরিশ্রমের ফল আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলতে দেখি। কিন্তু আমি তখনো একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার যে আমার হাতে রয়েছে তার গুরুত্ব টের পাইনি। ছোট এই উপাদান লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য যে জীবনদায়ী হবে ভাবতে পারিনি। যে কক্ষে এর আবিষ্কার সেই কক্ষটিকেও আমি কোনোদিন ভুলবো না। এই কক্ষে আমি গ্যাস পয়েন্ট ও জলের ট্যাপ ছাড়া মাসের পর মাস রাতে কেরোসিনের ল্যাম্পের আলোয় গবেষণা চালিয়েছি। আমার কাছে এই কক্ষ চিরকাল তীর্থক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে, যেখানে আমার মনোজগতে Urea Stibamine সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত হয়েছিল।'

লন্ডনের ক্যাম্ব্রিজ নিউজ প্রফেসর অশোকা জাহ্নবী প্রসাদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, এই ভদ্রলোক এই গ্রহের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই প্রফেসর জাহ্নবী প্রসাদ একজন মনোবিদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও লেখক। তিনি বলেছিলেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর অবদান ম্যালেরিয়ার পরজীবী আবিষ্কারক রোনাল্ড রস থেকে অনেক বেশি উল্লেখযোগ্য। কালাজ্বর ছাড়াও তিনি ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস, কুষ্ঠরোগ *leprosy*, গোদরোগ *filariasis*, সিফিলিস, ও ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়েও গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম ঢাকা ও কোলকাতায় মেয়াদী জ্বর *quartan fever* শনাক্ত করেন। স্ত্রী এনোফিলিস মশা এই রোগের পরজীবী বহন করে। কালাজ্বর বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থের নাম 'এ ট্রিটিস অন কালাজ্বর।'

১৯২৭ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি বাসগৃহের এক অংশে 'ব্রহ্মচারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর আবিষ্কৃত ওষুধের ফর্মুলা পারিবারিক গণ্ডির বাইরে প্রকাশ করেননি। প্যাটেন্টও নেননি। কারণ, ওষুধ ব্যবসায়ীরা জনগণ থেকে অধিক অর্থ শোষণ করবেন। তিনি কেবল বাগথেট কোম্পানির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে ওষুধ সরবরাহ করতেন। প্যাটেন্ট না নিলেও বাজারি সংস্থাগুলো একই নামে ওষুধ বিক্রি শুরু করলে তাঁকে আইনের আশ্রয় নিতে হয়। তিনি বিভিন্ন হাসপাতালে ওষুধ দান করে, রেডক্রস সোসাইটির মাধ্যমে তার বিবরণ বাংলার গভর্নরের কাছে পাঠাতেন। তাঁর অর্জিত বিশাল অংকের অর্থ তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস, ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটি অব ইন্ডিয়া, কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কোলকাতা ব্লাডব্যাংকে অনুদান হিসেবে নিয়মিত পাঠাতেন। 'সায়েন্স এন্ড কালচার' শিরোনামের জার্নাল তাঁরই অর্থে প্রকাশিত হতো।

নিবন্ধের শুরুতে জানিয়েছি ব্রহ্মচারীর যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য নোবেল কমিটিতে ১৯২৯ সালে দুবার ও ১৯৪২ সালে পাঁচবার তাঁর নাম প্রস্তাব করা হলেও তা মান্যতা পায়নি। জাতি বা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব এর কারণ বলে অনুমিত হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড লিটন ১৯২৪ সালে তাঁকে রায় বাহাদুর উপাধি ও কাইজার-ই-হিন্দ গোল্ড মেডেল প্রদান করেন। ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৪ সালে তাঁকে নাইটহুড উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি ১৯৩৬ সালে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগেসের ২৩তম সেশনে ফিজিওলজি ও মেডিসিন বিভাগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি অনবদ্য ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণের মূল বিষয় ছিল দীর্ঘ পরমায়ুলাভ, জাতিগঠনে সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি ও আহর্যের আবশ্যকতা ইত্যাদি। বক্তৃতায় যে আবিষ্কারের জন্য তিনি পৃথিবীময় আলোচিত সে ইউরিয়া স্টিবামাইন সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। তিনি ১৯৩৬ সালে কোলকাতাস্থ ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। তাঁকে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব মেডিসিন, লন্ডনেরই রয়াল কলেজ অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিন এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল সায়েন্স একাডেমি ফেলোশিপ দিয়ে সম্মানিত করেন।

উপেন্দ্রনাথ ১৯২৮-২৯ সালে দুই বছরের জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৩০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সভাপতির ভাষণে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'ভারত, প্রাচীন সভ্যতার দেশ। ক্রমে সে তার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করে সমৃদ্ধ হচ্ছে। সে ফেলে আসা দিনের মতো আবার আনন্দে মেতে উঠছে। বহু শতাব্দী ধরে যেসকল ব্যাধি অনারোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছিল এবং ভারতে বহু জীবন ধ্বংসের কারণ হয়েছিল, এখন সেসব রোগের ভয়াবহতা হ্রাস পেয়েছে।' তিনি ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান পদেও বৃত হয়েছিলেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যে কর্মনিষ্ঠা ও শ্রমের সাহায্যে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, চীন, গ্রিস, ফ্রান্সকে এই মারাত্মক ব্যাধিমুক্ত করে দিয়েছিলেন, পৃথিবী কিন্তু তাঁর প্রতি সুবিচার করেনি। যেমন সুবিচার পাননি, স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁরা তবু লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ও আমেরিকান একাডেমি অব সায়েন্স এন্ড আর্টস-এর স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ট্রপিক্যাল ডিজিসের সর্বময় কর্তা লিওনার্ড রজার্সের নেতৃত্বে ভারতীয় কতিপয় বিজ্ঞানীর চক্রান্তের শিকার হয়ে উপরিলিখিত সম্মান থেকেও বঞ্চিত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীর অন্যতম নেশা ছিল বই কেনা। তিনি একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেছিলেন। এছাড়া নানা ফ্যাশনের গাড়ির প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। লাউডন স্ট্রিটের বাড়িতে নানা জাতের ফার্ন, অর্কিড ও ক্যাকটাসের বাগান গড়েছিলেন। জীবনের শেষ ষোলো বছর ডায়াবেটিসে ভোগেন। ১৯৪৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি প্রায় ৫০ বছরের সুখী দাম্পত্য জীবনের সঙ্গী ননীবালা ও তিন পুত্র সন্তানকে রেখে তিনি প্রয়াত হন। •

তপন চক্রবর্তী
লেখক, শিক্ষাবিদ, গবেষক ও চিকিৎসাবিদ

জন্মশতবর্ষ

গল্পের নিরিখে সমরেশ বসু

অলাত এহ্‌সান

সমরেশ বসুর খ্যাতি নিঃসন্দেহে উপন্যাসের জন্য। গল্পের নিরিখে তাকে বুঝতে চাওয়া বিরাট ঝক্কির ব্যাপার বটে। 'কালকূট' আর 'ভ্রমর' ছদ্মনাম মিলিয়ে তার উপন্যাসের সংখ্যা শতাধিক। (সুরথনাথ বসু সাহিত্যে সমরেশ বসু হয়ে ওঠা বরং লেখকিনাম হিসেবে স্বীকৃত।) তবে প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা–দুই শতাধিক–বলছে, তিনি গল্পের আরেক সত্ত্বা বহন করতেন। ফলে গোয়েন্দা গোগল, দুঃসাহিক অভিযান, শিশু সাহিত্য ও কিছু প্রবন্ধ লিখলেও 'ঔপন্যাসিক' ও 'গল্পকার' বলে তার লেখক পরিচিতির প্রথম শব্দবন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাভাষার ছোট্ট বইয়ের বাজারে লেখালেখিকে একমাত্র পেশা হিসেবে নেওয়ার কারণে সমরেশ বসুকে বেশি লিখতে হয়েছে, না কি ভাবনার বৈচিত্র্য ও লেখার সামর্থ্যই তাঁর সাহিত্যের সংখ্যা বাড়িয়ে, সে আরেক বিচার বটে। সমরেশ বসুর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়ের লেখায় এর একটা উত্তর পাওয়া যেতে পারে–'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি লেখক এবং পেশাদার লেখক। ...তিনি আমাদের মতো অফিস-পালানো কেরানি লেখক ছিলেন না, যাঁদের সাহস নেই লেখাকে জীবিকা করার, অথচ ষোল আনার ওপর আঠারো আনা শখ আছে লেখক হওয়ার।' ফলে পেশাদার লেখক সমরেশ বসুকে গল্পের ভেতর দিয়েও খুঁজতে পারি

তেষট্টি বছরের জীবনে পঁয়ত্রিশ বছরই লেখালিখিতে সক্রিয় ছিলেন সমরেশ বসু। এ বছর আমরা তার জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন করছি। লেখক যে বিচারে তাঁর সমকালের সেরা পর্যবেক্ষক, সেই বিচারে লেখালিখি বুঝতে গেলে তাঁর সময়কে খানিকটা বোঝা জরুরি। এর মধ্যে দিয়ে লেখকের সমসাময়িকতায় প্রাসঙ্গিকতাও খানিকটা ধরা যেতে পারে। যদিও প্রয়াণের প্রায় তিন যুগ পরে তা সহজ হবে না বোধ করি।

নিঃসন্দেহে জীবনাভিজ্ঞতা থেকে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা না পান লেখক, তাই বলে সাহিত্য যে আত্মজীবনী না–সে কথা সবারই জানা। বরং কাহিনি বিন্যাসে সাহিত্যের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়, তাকে যথাযথ বিকশিত করতে পারার মধ্যেই লেখকের বড়ত্ব প্রকাশ পায়। তাতে গল্পের সঙ্গে কল্পও যুক্ত হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন 'কবিকে পাবে না কবির জীবন চরিতে।' তাই ভিক্টোরীয় যুগের মতো সাহিত্যিকের জীবন দিয়ে সাহিত্য বিচারের চাইতে সমরেশ বসুর সাহিত্য যে বাস্তবতার অবতারণা করেছে, তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। নোবেল বক্তৃতায় স্যার বিদ্যাধর সুরজ প্রসাদ নাইপল (ভি এস নাইপল) সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন আরো একবার।

যুদ্ধ, দাঙ্গা, মানবিক বিপর্যয় যে অনেকের মধ্যে লেখার স্ফুরণ ঘটিয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। তবে তার ওপর ভর করে বাংলা ভাষায় লেখালিখিকে পেশা হিসেবে নেওয়া সম্ভব নয়। ঘটনাক্রমে, সমরেশ বসুর লেখালিখির বহিঃপ্রকাশও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে দিকে। রাজনৈতিক কারণে কারাগারে থাকাকালেই প্রথম উপন্যাস লেখা শুরু করেন, পরে 'উত্তরঙ্গ' নামে প্রকাশ হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতবর্ষে শুধু যুদ্ধের মানবিক বিপর্যয়ের ব্যাপার ছিল না; একই সঙ্গে তা দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও স্বাধীনতা বা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মতো বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় উদ্বাস্তু-অভিবাস ঘটিয়েছিল। অবিভক্ত বাংলায় ঢাকার বিক্রমপুরের জন্ম নেওয়া সমরেশ বসুর পশ্চিমবঙ্গে থিতু হওয়াও এর অংশ। আবার ব্রিটিশভারতের মতো স্বাধীনভারতেও সময়টা প্রগতিশীল (কমিউনিস্ট) রাজনীতির জন্যও বিরাট সমস্যাশঙ্কুল ছিল। পরবর্তীতে কমিউনিস্ট বিশ্ববলয়ের দুই কেন্দ্রে ভাগ হওয়া (মস্কো–বেইজিং) এবং দেশের ভেতর শ্রেণিশত্রু খতমের সশস্ত্র রাজনীতির (নকশালবাড়ি) উত্থান ও নৃশংস নিয়ন্ত্রণ পর্যন্ত এর বিস্তার। এটা সমরেশ বসুর লেখালিখির উত্তুঙ্গ সময় বলা যায়।

ইছাপুর বন্দুক কারখানায় চাকরি, ট্রেড ইউনিয়ন করার সুবাদে পার্টি রাজনীতিতে জড়ানো সমরেশ বসুর জীবনের অংশ। তাঁর দেখার মধ্যেও ছিল একটা চটকল কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা একটি উপশহরের স্মৃতি। তার গল্পে সেখানকার অনেক চরিত্র এসেছে নানা নিরিখে। 'অকাল বৃষ্টি' সেই উপশহরের শ্মশানের ডোম, মৃত্যুর রেজিস্টার আর তাদের কাছে হাজির হওয়া এক উদ্বাস্তু নারীর গল্প।

'গঙ্গা' নামে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসের কথা মনে রাখলে, প্রকৃতি ও নদীপাড়ের জীবনকেন্দ্রিক সাহিত্যে সমরেশ বসুর অংশগ্রহণ বোঝা যায়। তার সাহিত্যে যেসব চরিত্র বারবার ফিরে এসেছে, তারা যেমন নদীনির্ভর জীবনযাপন করেন, তেমনি নদীর স্বভাবও তাদের জীবন গড়ে দিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এর কেন্দ্রে থাকে। আবার তাদের লড়াইয়ের উৎসাহ ও আস্থা, কৌশল ও রক্ষণ সেখান থেকেই আসে। আজকের দিনে যে পরিবেশগত বিপর্যয়ের কথা মহাসমারহে বলা হয়, তার শুরু সমরেশের চরিত্রদের প্রকৃতি থেকে উৎখাতের মধ্যেও পাওয়া যাবে। তবে শেষ বিচারে তারা একটা লড়াকু জীবন ধারণ করেই বেঁচে থাকে। সেখানে সাফল্য-ব্যর্থতার চেয়ে, বরং শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার স্পৃহাই টিকে থাকে।

'পাড়ি' গল্পে উনত্রিশটি শুকুর স্রোতস্বিনী গঙ্গা নদী সাঁতরে পার করে দেওয়া দম্পতির, 'লড়াই' গল্পে বাদাবন অঞ্চলে নদীতে জোয়ারের সময় জালের পড়া মস্ত পাঙাস মাছের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এক কিশোরের মৃত্যু, 'পাপ-পুণ্য' গল্পে আত্মঘাতী হওয়া নারীর লাশ থানা থেকে দীর্ঘ পথ পেরিয়ে শ্মশানে নেওয়ার পথে শকুন আর শেয়ালের কাছ থেকে রক্ষাসহ অনেকেই এর উদাহরণ হতে পারে।

সমরেশ বসুর অনেক গল্পই বিশ্ব ও স্বদেশি সাহিত্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। তবে লেখকের বর্ণনা ও ঘটনার নিরিখে তা নিজস্ব হয়ে ওঠে। সাধ্যাতীত বড় মাছ শিকারের গল্প বললেই মার্কিন সাহিত্যিক আর্নেস্ট হামিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্যা সি'র কথা মনে পড়ে পাঠকদের। 'লড়াই' গল্পে দীর্ঘ অপেক্ষার পর জলোচ্ছ্বাসের সময় জালে পড়া পাঙাস মাছকে বাগে আনার চেষ্টায় মুগুড় হাতে নেমে পড়ে এতিম কিশোর। শেষ পর্যন্ত পাঙাসটি আয়ত্তেও আসে। তবে লড়াইয়ের কোনো এক মুহূর্তে কাঁধে পাঙাসের কাঁটা বিঁধে কিশোরের মৃত্যু হয়। ব্যাপারটা প্রকৃতির কত দূর পর্যন্ত মানুষের আয়ত্তে আনতে চাইতে পারে ও চাওয়া উচিত, সেই নৈতিক প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। আজকের পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণও এই প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তা অস্বীকার করা যায়। গল্পে প্রাণের বিনিময়ে ধরা মাছটা আড়তদার নিয়ে কিশোরের বাবার রেখে যাওয়া ঋণের দায়ে। এটা রাজনীতি সচেতন সমরেশ বসুর আরেক প্রহেলিকা বটে।

সমরেশ বসুর 'অকাল বৃষ্টি' গল্পটা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের আমেজ নিয়ে আসে, আর 'অকাল বসন্ত' গল্পটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের কথা মনে করে দিলেও দুয়ের পার্থক্য করতে কোনো অসুবিধা হয় না। যেমন 'পাপ-পুণ্য' গল্পটা সফক্লিসের নাটক 'ইদিপাস'র কথা মনে করিয়ে দিলেও তা 'ইদিপাস কমপ্লেক্স'র বিপরীত সমীকরণ। ইদিপাসের কাহিনি যেমন নিয়তি নির্ধারিত কল্পকে বাস্তবায়ন করেন, 'পাপ-পুণ্যে' বরং নিয়তি বিড়ম্বিত এক বাবা গদাই ঘোরের মধ্যে মেয়ে বিন্দুর সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। লেখক সেখানেই থেমে থাকেননি। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে রাজা ইদিপাস তার 'পাপ' বুঝতে পেরে চোখ উপড়ে ফেলে নিজেকে শাস্তি দেন; সমরেশের ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গল্পে আত্মঘাতী হয় মেয়ে বিন্দু; আবার যিশুর নিজের কাঁধে ক্রুশ বহনের মতো শেষকৃত্যের জন্য তার লাশ দীর্ঘ পথ ভ্যানে বহনের মধ্যে দিয়ে প্রায়শ্চিত্য করতে হয় বাবাকে। অবশ্য গল্পে 'বউখেকো' কেতুর সঙ্গে বিন্দুর ওতোপ্রোতোতা উহ্য ছিল না মোটেই।

লক্ষ্যণীয় হলো, সন্তান ইদিপাসের মতো সত্য জানায় উদ্‌গ্রীব হওয়ার মতো দার্শনিকতায় উন্নীত নন পাপ-পুণ্য গল্পের বাবা গদাই, বরং মেয়ের আত্মহননের সত্যটা জেনেই প্রায়শ্চিত্য করতে হয় তাকে। চরিত্রের এই যে দার্শনিকতার সংকট, সেটা সমরেশ বসুর সাহিত্যে প্রায়ই দেখা যায়। আদতে তার তৈরি চরিত্ররা সমাজের যে স্তর থেকে উঠে আসে, তাদের দর্শন থাকার চেয়ে পেট চালানোর লড়াই বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। যেমন বলা হয়ে থাকে, দর্শন শেষ বিচারে অবসর আর সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত প্রশ্ন।

সমরেশ বসুর চরিত্ররা বরং ক্ষুব্ধ, জীবনের প্রতি কমবেশি বীতশ্রদ্ধও বটে। 'অকাল বৃষ্টি' গল্পের শ্মশানের শবদাহের রেজিস্টার ভূতেশ যেমন বলে–'এক এক সময় মনে হয়, শালা দুনিয়াটাকেই খাতায় তুলে ছেড়ে দিই।' অর্থাৎ তার মৃত্যু-রেজিস্ট্রির খাতায়। তার সহকারী ডোম সিধু বরং আরেক কাঠি সরেশ–'খাতায় তুলে কি হবে ঠাউর (ঠাকুর), দিতে হয় চিতায় তুলে দেও, কাজ হবে।' আবার 'অকাল বসন্ত' গল্পে মিউনিসিপ্যালেটির ট্রাক ড্রাইভার অভয় বলে–'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম, এখন ওসব বালাই নেই।'

অর্থাৎ চরিত্রগুলোর মধ্যে অস্বস্তি আছে। তারা যাপন করছে বটে, তবে কিছুই অবলীলায় মেনে নেয়নি, দ্রোহ আছে, বিরোধ আছে। এ কারণে তাদের কাছে অনেক প্রাকৃতিক বিষয়ও অ-উপসর্গ যোগে বিপরীত হয়ে গেছে। সমরেশ বসুর গল্পের অনেক নামেই তার আভাস পাওয়া যায়। যেমন–'অকাল বৃষ্টি', 'অকাল বসন্ত', 'অপরিণত', 'অশান্ত', কিংবা উপন্যাস 'অশান্ত'। বিরোধাভাস পাওয়া যায় অনেক নামে, যেমন গল্প–সফল-অসফল, পাপ-পুণ্য, অরণ্য নিশি, জোয়ার-ভাটা; উপন্যাস–এপাড়-ওপাড়, নিঠুর-দরদি, টানা পোড়েন, হারিয়ে পাওয়া। এই যে বিরোধাভাস, একটা সাহিত্যের সৌন্দর্যও। একইসঙ্গে সমাজের দ্বন্দ্বকেও প্রকাশ করে।

বলা অপেক্ষা রাখে না, আমরা এমন সময় ও সমাজে বাস করি, যেখানে স্ববিরোধ ছাড়া বাঁচতেই পারি না। এক সাক্ষাৎকারে অরুন্ধতী রায়ও বলেছিলেন এই কথা, পুঁজিবাদের বিরোধিতা করেও বৃহৎ পুঁজির প্রতিষ্ঠানে বই প্রকাশ প্রসঙ্গে। তার মতে, লেখা প্রকাশের প্রতিষ্ঠানের চেয়ে লেখার ভেতর চিন্তায় একনিষ্ঠতা তার কাছে বেশি জরুরি। একইভাবে, সমরেশ বসুর চরিত্ররা সমাজের যে স্তরেই থাকুক, তাদের দিয়েই সমাজের দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি। ক্ষোভ, তিক্ততার মধ্যেও তারা মানবিক।

অশ্লীলতার অভিযোগের মতো সমরেশ বসু সমকালে প্রায়ই সমালোচনার শিকার হয়েছেন, তার লেখায় দার্শনিকতা নেই বলে। এটা

সত্য, তার মধ্যে দার্শনিক বাক্যের ছড়াছড়ি নেই বটে, তবে সেই প্রশ্নও নিয়ে আসেন কাহিনির ভেতর দিয়ে।

'পাপ-পুণ্য' গল্পে কারণ না জানলেও আত্মহননের পর মরদেহ গ্রামে নেওয়া যাচ্ছে না, অচ্ছুত হয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য একই সঙ্গে মানুষের ধর্ম কী? মৃত্যু কোনো ধর্মমত মেনে চলে কি না?–সেই প্রশ্নও সামনে নিয়ে আসে। যেভাবে, কয়েকদিনের মরদেহের গন্ধে এগিয়ে আসা শকুন আর শেয়ালের মতো মৃত-আহারি রূপকের আক্রমণ থেকে রক্ষার ভেতর দিয়ে লেখক সমাজের নিয়মবেত্তাদের লড়াইয়ে দিশা দেয় গদাই। মৃত্যু প্রসঙ্গ তার সাহিত্যে নানাভাবে এসেছে, প্রায় সাবলীল ও কেন্দ্রীয় প্রভাব নিয়েও। তবে চরিত্ররা সেখানে আটকে থাকেনি জীবনধারণের তাগিদে।

রাজনীতি নিজেই এক দার্শনিক বিষয়। সমরেশ বসুর রাজনৈতিক সংশ্রবের কথা মোটেই অবিদিত ছিল না পাঠকের কাছে, কমিউনিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার আস্থা ছিল তার, সে আভাস আগেই দিয়েছি। লক্ষণীয় হলো, তার সেই আস্থা পার্টির চাপিয়ে দেওয়া 'ডগমাটিক' কিছু না, বরং বারবার তার বাইরে গিয়েছেন বলেই তার চরিত্ররা প্রাণবন্ত ও প্রাসঙ্গিক। একই কারণে তার গল্পের সমাপ্তি একশেষ দ্বন্দ্বের সমাধান নয়; অনির্দিষ্ট ও উন্মুক্ত। ফলে পার্টির নেতাদের কাছ থেকে অশ্লীলতার অভিযোগ শোনা ও তাকে এড়িয়ে চলা বিচিত্র কিছু ছিল না।

একটা সমাজকে বোঝার গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে তার ভেতরে অপরাধী প্রশ্নে সংবেদনশীলতাকে বোঝা। এসব বুঝতে চেয়েছিলেন বলেই লিও তলস্তয়, ফিওদর দস্তয়েইভস্কি, ফ্রাৎস কাফকা বা মিলান কুন্দেরা গুরুত্বপূর্ণ। তলস্তয়ের সাহিত্যের চরিত্ররা কোনো অপরাধের পর নিজেই নিজেকে শাস্তি দেয়; দস্তয়েইভস্কির চরিত্ররা নীতিগতভাবে অপরাধ করতে চায় অন্যের মঙ্গলের জন্য, মানসিক দ্বন্দ্বে আত্মসমর্পণের পর তাকে শাস্তি দেয় রাষ্ট্র। আর কাফকার চরিত্ররা জানেই তাকে কেন শাস্তি দেওয়া হয়েছে, বরং রাষ্ট্রের জেরার মুখে ভাবতে বসে সে কোনো অপরাধ করেছে কি না। তাহলে এই প্রশ্নে সমরেশ বসুর বিচার কী? বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকে সবখানেই প্রচণ্ড নজরদারির মধ্যে অপরাধীর প্রশ্নটা রাষ্ট্রের অবস্থানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাই আইনির নিরপক্ষতা ও সর্বজন সমর্থন দাবি করে রাষ্ট্র। আবার রাষ্ট্র কাকে অপরাধী খ্যাত করবে, তা আবার রাজনৈতিক প্রশ্ন বটে।

'স্বীকারোক্তি' গল্পের শুরুতেই বলা হচ্ছে, '১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত একটি রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দি অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত।' সময় দেশভাগের বা ভারতের স্বাধীনতার পরের ঘটনা। কিন্তু দেখা যাবে, গল্পের বাস্তবতা ষাট-সত্তুর দশকে পশ্চিমবঙ্গে পার্টির রাজনৈতিক অবস্থার ভেতরে সংকট ও ক্ষমতার চর্চা বোঝার জন্যও প্রাসঙ্গিক।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পর থেকে লতিয়ে ওঠা 'স্বদেশী' উদ্বুদ্ধ সাহিত্য বিশের দশকের পর রাজনৈতিক দর্শনের প্রজ্ঞায় ক্রমেই মার্কসবাদী সাহিত্যের রূপ নিতে থাকে। সেখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যসহ পার্টিজানরা গণমানুষের সাহিত্যের নামে পার্টি কথিত ভবিষ্যৎ বক্তব্যেরই প্রতিফলন ঘটাতে চেয়েছেন, উত্তর প্রজন্মের সমরেশ বসু বরং এর থেকে অনেকটা আলাদা। তার প্রতিফলন পাওয়া যায় 'স্বীকারোক্তি' গল্পে। এই স্বীকারোক্তি এক অর্থে লেখকের নিজেরও।

গল্পটা জার্মানে নাৎসিবাহিনীর হাতে নিহত চেকস্লোভাকিয়ার সাংবাদিক জুলিয়াস ফুচিকের বিখ্যাত 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' বইটা কথা মনে করিয়ে দেবে। তবে সমরেশ বসু গল্পকে সেই নির্যাতনের দগদগে বর্ণনার বাইরে না এনে বরং আরো গুরুতর বিষয়ের দিকে নজর দিতে চান। গল্পে অনল নামে এক তরুণকে গোয়েন্দা পুলিশের এক দপ্তর থেকে আরেক দপ্তরে নেওয়া হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। 'বে-আইনী' ঘোষিত একটা গোপন সশস্ত্র দলের সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রের চোখে সে 'অপরাধী', তা তরুণও জানে। তবে ঠিক জানে না, এখনই তাকে কোন 'অপরাধে' জেরা করা হবে। ফলে জিজ্ঞাসাবাদের টেবিলে, গোয়েন্দা কর্তার প্রশ্নের বিপরীতে, মগজ খালি করা প্রহসনে, নির্যাতনের নমুনা ছড়ানো সেল ঘুরে ঘুরে মনে করতে হয়, তাকে কেন ধরা হয়েছে।

পার্টির শীর্ষ নেতাদের একজন মিহির ক্ষমতা সুসংহত করতে ধ্রুব নামে একজন গোপন দল থেকে বহিষ্কার করে, মানে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কাছে ধরা পড়ার মতো অবস্থা করে দেয়। মানবিকতা দেখিয়ে অনল তাকে প্রথমে নিজের কাছে, পরে টাকা দিয়ে অন্যখানে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। এসব তথ্য ছিল কেবল প্রেমিকা নীরার কাছে। পার্টির সিদ্ধান্তের বাইরে মানবিক সহযোগিতা করার জন্য তাকে ডেকে জবাবদিহি করা হাসতে ভুলে যাওয়া শীর্ষ নেতা, জীবননাশের ঝুঁকি তৈরি হয়। পরে গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে ধরা পড়ার পর দেখা গেল নীরাই এক চিঠিতে অনলের 'পার্টির বেআইনী' কাজের তথ্য মিহিরকে জানিয়েছে। জেরার সময় গোয়েন্দারা সেই চিঠি দেখালে মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলে অনল। তার বুঝতে বাকি থাকে না, পার্টির নেতা, প্রেমিকা তার সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়ায়, রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলের কথা বললেও পার্টির শৃঙ্খলা-গোপনীয়তা আসলে ক্ষমতার সুসংহত করার খেলায় পরিণত হয়েছে। যেমনটা এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন–'বিপ্লব করেই-বা কী সোনার রাজত্ব তৈরি করবেন আপনারা। ইংরেজ আমলে আমরাও অনেক কিছু ভেবেছিলাম।' তার কথায়ই পরিষ্কার হয়ে যায়, রাষ্ট্রের কেবল ক্ষমতা বদলেছে, ব্যবস্থা নয়। অনেকটা ক্রাইম থিলারের মতো উত্তেজনাভরা গল্পটি।

সমরেশ বসুর গল্পগুলো একটা ঘটনার দৃশ্যায়ন মাত্র নয়, বরং এর পেছনে তার ভাবনার বিস্তারটা বোঝা জরুরি। তার গল্পের চরিত্রগুলো একটা বাস্তবতা তুলে ধরে, সেটা রির্পোটাজ ধরনের নয়, একটা প্রস্তাবও সামনে আনে; তা হচ্ছে এই সময়টা অস্বস্তিকর, ভঙ্গুর, ঘুণে ধরা। এখানে মানবিকতা নেই, মানুষের সম্মানও নেই। এটা ভেঙে পড়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং জরুরি। হয় রূপান্তর করতে হবে ভেতর থেকে, নয়তো নিজেই ভেঙে পড়বে।

সমরেশের 'বিবর', 'প্রজাপতি' উপন্যাস 'অশ্লীল' তকমায় সে সময় নানাভাবে সামনের সারি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মজার বিষয় হলো 'অশ্লীল' নামেও তার একটা উপন্যাস ছিল, সেটা অশ্লীলতার দায় তেমন বহন করতে হয়নি। একের পর এক বইয়ে অশ্লীল তকমা আটা, আসলে সমাজে যৌনতা সহনশীল হয়ে না ওঠার সঙ্গে যুক্ত। মিশেল ফুকো তার 'যৌনতার ইতিহাস' বইয়ে দেখিয়েছেন, এটা বহুকাল ধরে সমাজে পুরুষের ক্ষমতাচর্চা, আর একইসঙ্গে আজকের দিনে পুঁজিবাদের 'সেক্স বিজনেস'র সঙ্গে সম্পর্কিত। অশ্লীল তকমার জবাবে উর্দুভাষি কথাসাহিত্যিক শাহাদৎ হাসান মান্টো যেমন বলেছিলেন, 'আমরা গল্পগুলো যদি অশ্লীল হয়, তাহলে এই সমাজটাই অশ্লীল।' একই ব্যাখ্যা হতে পারে সমরেশের ক্ষেত্রেও।

মান্টোর সময়ে ইংলিশ ঔপন্যাসক ডি. এইচ. লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লিয লাভার' নিষিদ্ধ হয়ে আদালতে পর্যন্ত গড়িয়েছে। অহরহ ভুল ব্যাখ্যায় জেরবার লরেন্স শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছা-নির্বাসনেই গিয়েছিলেন। অবশ্য পরে ই এম ফরস্টার তাকে 'প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল ঔপন্যাসিক' আখ্যা দিয়েছেন। অশ্লীল রবের মুখে সমরেশ বসুও একপ্রকার স্বেচ্ছা-নির্বাসন ব্রত পালন করেছেন। তুমুল অর্থকষ্ট তাকে জেরবার করেছে। পার্টি থেকে সরে আসতে হয়েছে, সুহৃদরাও খানিকটা এড়িয়ে চলেছেন।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সমরেশ বসু যখন সমাজের অবদমন ভেঙে যৌনতার মুক্তি মুখিনতা দেখাচ্ছেন, তার আগেই, ১৯৪৯ সালে ফ্রান্সে নারীবাদী লেখিকা সিমন দ্য বুভুয়ারের বিখ্যাত 'লা দাপিয়েজম সেক্স' (দ্বিতীয় লিঙ্গ) প্রকাশ হয়েছে। সিগমুন্ড ফ্রয়েডের অবদমিত মন, মনোসমীক্ষা ততদিনে বহুল চর্চিত বিষয়। সমরেশ বসু বরং বুভুয়ারের সেই উদ্বোধনে বাঙালি লেখক হিসেবে সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে সাড়া দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ-সময় সেটা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। এখানো যে পুরোপুরি আছে, তাও নয়। এজন্যই এখনো প্রাসঙ্গিক হয়ে যান সমরেশ বসু।

'স্বীকারোক্তি' গল্পে তরুণদের স্বপ্নভঙ্গের কথা বলছেন লেখক। এই বাস্তবতা এখনো সেখানে বিদ্যমান। রাজনীতিই সমাজের সব সমস্যা সমাধানের ওষুধ নয়, সেই উপলব্ধি কেউ বলছে না। বরং হাতে থাকা গুটিকয় সমাধান দিয়ে সমাজের অসুখ খুঁজে বেড়ানোর যে ঐতিহাসিক সংকট, তা বোঝার জন্য আজকের দিনেও, শতবর্ষী এই লেখকের সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তাও থেকে যায়, সমান তালে। •

অলাত এহ্সান
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

প্রবন্ধ

যোগেন মণ্ডলের দেবেশ রায়

চৈতন্য চন্দ্র দাস

রাজনীতিনির্ভর কথাশিল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকার দেবেশ রায় স্ব-কালের প্রায় সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যকাণ্ডের পুরোধা কিংবা অংশী ছিলেন। ঈর্ষণীয় প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের কারণে দেবেশ রায় সারস্বত্য-সমাজের মণিস্বরূপ। সমকালীন বিদ্বৎ-সমাজ তাঁকে যারপরনাই সমীহ করতেন। বড়ো মানুষেরা সাধারণত নোতুন লেখকদের প্রতি উদাসীন থাকেন। অথচ, বাংলা সাহিত্যের আকাশে প্রায় সূর্যের সমান শক্তিশালী হয়ে ওঠা দেবেশ রায় তরুণ লেখকদের জন্যে ছিলেন নিরন্তর উৎসাহ-আধার। আমৃত্যু লিটল ম্যাগাজিনের চেতনাকে ধারণ করেছেন তিনি। নোতুনদের সাথে ছোটকাগজে বিস্তর লিখেছেন। তাঁদের কাজ সম্বন্ধে ঠিকঠাক নজর রেখেছেন। সম্পাদককে হাতে-কলমে সম্পাদনার পাঠ দিয়েছেন।

একসময় শূদ্রের বিদ্যার্জনের কোনো অধিকার ছিলো না। শূদ্র অপবিত্র, তাই তার কানও অপবিত্র। সুতরাং, ধর্মগ্রন্থের পবিত্র বাণী প্রবেশজনিত অপরাধের জন্যে শূদ্রের অপবিত্র কানে উত্তপ্ত-গলিত সিসা ঢেলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। শূদ্রের ধনসঞ্চয়ের ছিলো না। কাক-কুকুরের সমগোত্রীয় গণ্য করা হতো তাকে

'চণ্ডাল' বলে তারা থাকবে লোকালয় থেকে দূরে। তাদের পরিধেয় হবে শ্মশানের শবদেহ থেকে সংগৃহীত কাপড়। কোনোরূপ ভদ্রগোছের নাম পর্যন্ত রাখতে পারতো না শূদ্ররা। এ ইতিহাসে তথ্যগত বা অতিরঞ্জনজনিত ভিন্নমত থাকলেও এর চেতনায় রয়েছে নির্মম-নির্ভেজাল সত্য, যার নির্যাস নিয়ে দেবেশ রায় লিখেছেন তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'। ধর্মের নামে অধর্মের করালতা, সমাজ-নিয়মের ভয়ংকরতা, সংস্কারের যাঁতায় পিষ্ট হওয়া, ইতিহাসের মূকতা, ঐতিহ্যের স্থবিরতা-নির্লিপ্তি, স-ব সইতে হয়েছে যোগেন মণ্ডলকে।

ওড়াকান্দির হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের দর্শনে উজ্জীবিত তারকচন্দ্র ঠাকুর, কুমুদবিহারী মল্লিক, শশিভূষণ ঠাকুর, গুরুচাঁদের পৌত্র ও ঠাকুরনগরের প্রতিষ্ঠাতা প্রমথ রঞ্জন ঠাকুরসহ অনেকে দেশে-বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদেরকে সমাজের অপরিহার্য ও কার্যকরী অংশ করে তোলেন। শিক্ষায়, সামাজিক-রাজনৈতিক কার্যকাণ্ডে তাঁরা অনেক ক্ষেত্রেই বামুন-কায়েতদেরকে ছাপিয়ে যান।

জগদ্বন্ধুসুন্দরের মানবতাবাদী দর্শন নিম্নবর্গের মানুষকে ব্যাপক মাত্রায় প্রাণিত করে। সমাজ-ধিক্কৃত ধাঙর শ্রেণিকে 'বান্ধব' অভিধায় অভিষিক্ত করাই শুধু নয়, তাদেরকে মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের এবং কীর্তনের অধিকার দেন তিনি। জোতদার-জমিদার ও বামুন-কায়েতের দাপটের বাস্তবতায় এটি বিরাট তোলপাড় করা ঘটনা হরিচাঁদের আধ্যাত্মিকতা, গুরুচাঁদের শিক্ষা-ভাবনা, জগদ্বন্ধুসুন্দরের মানবতাবাদ যোগেনের মনন গঠনে সহায়তা করেছে (শেষতক যোগেন অবশ্য মতুয়া-দর্শনের সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেন)। শূদ্রের কল্যাণ ব্যতিত অন্য চিন্তা তাঁর নেই। নিজেকে ভদ্রলোক করে গড়ে তুলতে বত্রিশটি বছর দমবন্ধ করে বেঁচেছিলেন যোগেন। ভদ্রলোক না হতে পারলে পশুপাখি বা জন্তু-জানোয়ারের মতো জীবনাতিপাত করতে হবে তাঁকে। শূদ্রকে সম্মাননীয় জাতিতে পরিণত করবার চেতনাই যোগেনকে রাজনীতির মঞ্চে নিয়ে এসেছে।

স্কুলের সহপাঠীরা যোগেনের সাথে বসতো না। শিক্ষক-অভিভাবক-পরিবেশীর নানান অসম্মানজনক আচরণ তাঁকে দমাতে পারেনি। একবার সরস্বতী পূজায় অধিকার-বঞ্চিত হয়ে পাল্টা পূজার আয়োজন করেছেন। বরিশালের কালীমন্দিরের পুরোহিত শূদ্রদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করায় ছাত্রাবস্থাতেই বিক্ষোভ করেছেন তিনি। যোগেন নিজের শূদ্র পরিচয়ে কখনও বিচলিত ছিলেন না। প্রাহসনিক ভাষায় নিজেকে 'চাঁড়াল' বলে পরিচয় দিতেন। সমাজ বামুন-কায়েতকে জন্ম থেকেই ভদ্রলোক বানিয়ে দেয়। অথচ, নমো মরার পরেও নমোই রয়ে যায়! সেকালের ভারতবর্ষে ক্ষমতা মানেই ছিলো বর্ণহিন্দুর ক্ষমতা। তাই তো, সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বামুন-কায়েতদের সমকক্ষতা অর্জন করা কিংবা তাদেরকে ছাপিয়ে যাওয়াকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করলেন যোগেন। 'কিতাব পড়িতে নাহিক শূদ্রের অধিকার'–বিষবাণীকে তুড়ি মেরে লেখাপড়া শিখেছেন। এমএলএ হয়েছেন নমঃশূদ্রদের পক্ষে আইন তৈরি করবার উদ্দেশে।

বার্থী তারা ইনস্টিটিউশনে বর্ণহিন্দুর নানান কূটচালে লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও প্রিয় শিক্ষক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে যোগেন পড়াশোনা চালিয়ে যান। বংশানুক্রমে রক্তবীর্যে ঘাপটি মেরে থাকা ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণে, হয়তো অবচেতনেই, সেই আশুতোষ স্যারও যোগেনকে 'অস্পৃশ্য' বলে কটাক্ষ করেছেন। যোগেন এতে মনঃক্ষুণ্ন হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু, দমে যাননি।

এমএলএ নির্বাচিত হওয়ার পর আশুতোষ স্যার তাঁকে নিয়ে সমাজের বিশিষ্টজনের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময়, সুযোগ বুঝে যোগেন আশুতোষ স্যারকে প্রত্যাঘাত করে বলেছেন–

'আপনাগ যে স্যার কতরকম পুত্র হয়... তার উপর দোষ দ্যান মুসলমানগ চার বিবি বইল্যা। আরে, অগ তো বিবি। আর আপনাগ তো পুত্রের বিছন। নিজেরডাও পুত্র। বন্ধুরা কইর‍্যা দিলেও পুত্র। বিয়্যার আগে গর্ভবতীরও পুত্র।'

হেডমাস্টারের বাড়িতে বর্ণহিন্দু আর খানদানি মুসলমানদের জন্যে ঝকঝকে কাঁসা-পিতলের বাসনের ব্যবস্থা থাকতো। নমঃশূদ্র ও সাধারণ মুসলমানদের জন্যে থাকতো কলাপাতা। পূর্বে যোগেনকে কলাপাতায় খাবার পরিবেশন করা হলেও এমএলএ যোগেনকে, সামাজিকতার খাতিরে, একটি ঝকঝকে বাটিতে করে পায়েশ খেতে দেওয়া হয়। বর্ণহিন্দুর বাড়িতে

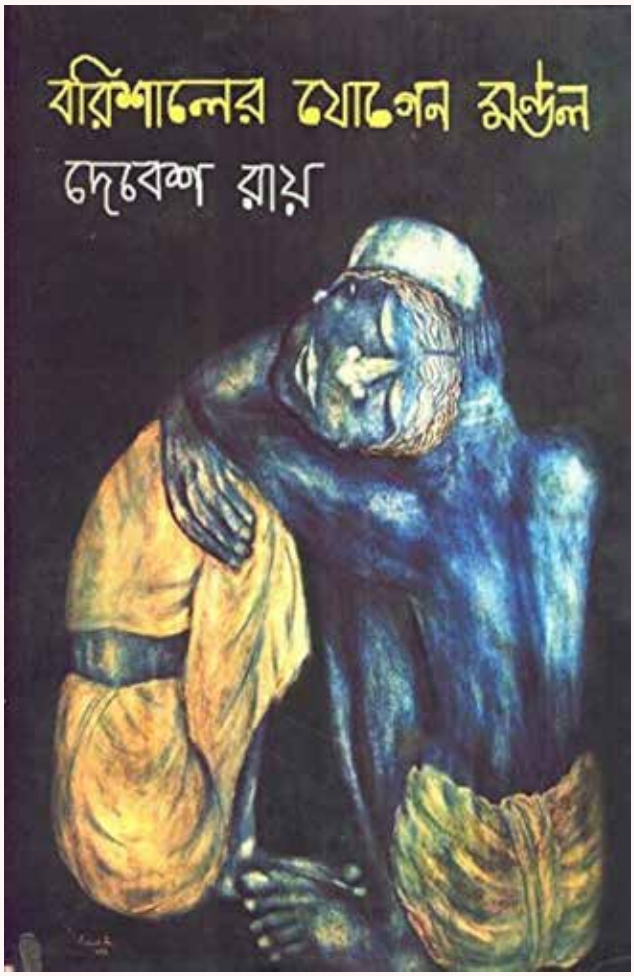

সৌজন্য সাক্ষাৎ-কালে তাঁকে বারবার অসম্মান করা হয়েছে। এমনকি, এমএলএ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে বসতে পর্যন্ত বলা হয়নি।

বরিশালের গৌরনদী উপজেলাস্থ মৈস্তারকান্দির শূদ্র-সন্তান যোগেন মণ্ডলকে লেখক 'বরিশালের মেগাস্থিনিস' বলে অভিহিত করেছেন। বাল্যকাল থেকে যোগেনের শিরায়-উপশিরায়-কৈশিকজালিকায় অধিকার আদায়ের সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয়েছে। বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষগণ শূদ্রত্বের অভিশাপকে ললাট-লিখন মেনে নিলেও যোগেন যেন ভিন্ন ক্রোমোজোমিক বৈশিষ্ট্যে গড়া। তাঁর ডিএনএ শূদ্রত্বের আবহমান-ঘৃণধরা-অচল সংস্কার মানে না। ১৯৩৭ সালে সে কারণেই শিডিউল্ড-কাস্টের জন্যে বরাদ্দকৃত সিটে না দাঁড়িয়ে, সাধারণ সিট থেকে অশ্বিনী কুমার দত্তের ভাতিজা সরল দত্তকে তাঁরই কেন্দ্রে হারিয়ে, অখ্যাত যোগেন এমএলএ নির্বাচিত হন। কেবল বাংলায় নয়, গোটা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে শোরগোল–'কে এই যোগেন'? গান্ধী, জিন্না, নেহেরু, সুভাষ, হক, সারওয়ার্দি, নাজিমুদ্দিনসহ সমকালীন সকল প্রথিতযশা রাজনীতিক, দল-মত-সমর্থক নির্বিশেষে সকলের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠলেন তিনি। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছয়, ফজলুল হকের মতো বিরাট ব্যক্তিত্ব যোগেনকে ডেকে পাঠান, সাথে করে নিয়ে কোলকাতা যান। তাঁর মাধ্যমে তপসিলি সম্প্রদায়ের অন্যান্য এমএলএ-র সমর্থন আদায় করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

সমকালীন প্রায় সকল রাজনীতিবিদ এমনকি শাসক ইংরেজ পর্যন্ত গান্ধীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বিচক্ষণতায় জিন্না অনেক ক্ষেত্রে এহেন গান্ধীকেও টেক্কা দিয়েছেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবর্তক-সমর্থক হলেও ব্যক্তিজীবনে তিনি প্রগতিশীল ছিলেন। সুভাষ বোসের অবিসংবাদিত দেশপ্রেম ও সাহসিকতা আজও সবাইকে প্রাণিত করে। অনিঃশেষ অবদানের জন্যে অম্বেদকর দলিত সমাজে ভগবানের আসনে অধিষ্ঠিত।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের রাজনীতি যেন চাঁদের হাট! দ্বিজাতিতত্ত্ব, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম-পরিকল্পনা, বাংলা-ভাগ ইত্যকার নানান অনুষঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের রাজনীতি যখন টালমাটাল, ঠিক তখন, বরিশালের অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে আসা যোগেন মণ্ডল এতোসব বড়োবড়ো রাজনীতিকের ভিড়েও নিজের অবস্থানকে অনন্য করেছেন–এটি চাট্টিখানি কথা নয়!

যোগেন মণ্ডল সবসময় হক শাহেবের মতো, ঢাকা-কোলকাতা, জনসভা-পার্লামেন্ট, বাঙাল-ঘটি নির্বিশেষে, বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। এতে তিনি স্বচ্ছন্দ ছিলেন এবং গর্ববোধ করতেন। কথনে-আচরণে তাঁর ছিলো সম্মোহন-আবেশ। ছিলো বিশেষ প্রতীতীর বৌদ্ধিক জেল্লা। শরৎ বোস যোগেন-চারিত্র্যে ইমপ্রেস্‌ড হয়ে সুভাষ বোসকে যোগেনের বিষয়ে জানালে সুভাষও যোগেনের সাক্ষাৎ পেতে উদগ্রীব হন। সাক্ষাৎ-কালে যোগেন তাঁর 'চাঁদসী-চিকিৎসা' করেন। চিকিৎসায় খুশি হয়ে সুভাষ বোস তাঁকে 'বিধান রায়ের চাইতেও ভালো চিকিৎসক' বলে অভিহিত করেন। সুভাষের সাথে কথোপকথনে যোগেন বলতে দ্বিধা করেননি, 'বর্ণহিন্দুরাই শূদ্রদের চিরকেলে শত্রু'। বর্ণহিন্দুর কারণেই শূদ্ররা আজ 'কীটস্য কীট'-এ পরিণত। সুভাষ তখন যোগেনের উদ্দেশে জাতি-বর্ণ-গোত্র-সম্প্রদায়ের অখণ্ডতার প্রসঙ্গে বলেন–

'সারা দেশটাই পরাধীন, অপ্রেসড, ডিপেসড, সাপ্রেসড। ...যতোদিন পরাধীনতা থাকবে, ততদিন এসব থাকবে। পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলে এগুলো দূর হবে না।'

সুভাষের সাথে ঐকমত্য পোষণ না করে দৃঢ়চেতা যোগেন নিজের মতাদর্শে অবিচল থাকেন।

নবাব-জমিদার-মন্ত্রীর সাথে উঠে-বসে, যোগেন এখন পরিপক্ব রাজনীতিক। যে ফজলুল হক রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, নেতৃত্বগুণ, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতার কারণে যেকোনো সভার ফোকাল-পয়েন্ট হয়ে উঠতেন, তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে নিরন্তর তর্ক করেছেন যোগেন। একদিন যোগেনের এ স্বাধীনচেতা মানসিকতায় বিরক্ত হয়ে হক শাহেব তো বলেই বসলেন–

'আরে, আইনল্যাম একডা নেয়াপাতি নারকেইল সে গৌরনদী থিক্যা। কইলকাতায় পা দিয়্যাইহইয়া গেলো স্বাধীন। সব্বাই মিল্যা ওর মাথা চিবাইয়া লিডার কইর‍্যা তুলছে।'

তথাপি যোগেন হক শাহেবকে ধরা দেননি! কারণ, ততোদিনে তিনি বুঝে গেছেন, হক শাহেব আসলে স্বার্থান্ধ। টাকা আর ক্ষমতার জন্যে তিনি করতে পারেন না, হেনকাজ নেই।

যোগেন মণ্ডল এমএলএ নির্বাচিত হওয়ার পরও সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে বাল্যবন্ধু প্রহ্লাদকে নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন, সভা-সমিতিতে যোগ দিয়েছেন। জনসংযোগে-জনসভায় অবস্থানকালে অফিসারদের প্রোটোকলে বিব্রত হতেন যোগেন। বিলাসবহুল ট্রেন-যাত্রায় পাগরি পরিহিত বেয়ারাদের 'স্যার' সম্বোধন, দামিদামি খাবার পরিবেশনা, ব্যবহার্যে ও আসবাবে আভিজাত্য-প্রদর্শনের বাহার দেখে হকচকিয়ে যাওয়ার অনুষঙ্গসমূহ তাঁর সহজতার সাক্ষ্যবাহী। আজ-দিন এমন রাজনীতিবিদ পাওয়া প্রায়-অসম্ভব। যোগেনের সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাথে তেমন যোগ ছিলো না। এ সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর ভাষ্য–

'আপনি তো ঘরের কাউকেও চেনেন না, মিটিং এর মানুষ হইলে চেনেন।'

ওড়াকান্দিতে প্রতিবছর আয়োজিত হতো 'নমঃশূদ্র বিজয়-যাত্রা'। এতে শূদ্র-মুসলমানের দ্বান্দ্বিকতাকে গানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হতো। গানের নমুনা ছিলো এরূপ–

'লুঙ্গিতে ঢাকি রাকি সুন্নত ধন।
ঐ মুসলমান আসে শূদ্র করিতে নিধন।'

অসাম্প্রদায়িক যোগেন এতে ব্যথিত হয়ে কৈশোর-যৌবনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কবিয়াল হয়ে ওঠেন। বৈরাগীর চাপানের বিপরীতে যোগেনের উতোরে চারদিক জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়। যোগেন গেয়ে ওঠেন–

'শেখ আর শুদ্দুরের একই দুশমন।
বামুন-কায়েত-বৈদ্য উচ্চ হিন্দুগণ।'

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বর্ণিল চরিত্র বরিশালের যোগেন মণ্ডল। কংগ্রেসের চাইতেও প্রাচীন-প্রাজ্ঞ অশ্বিনীকুমার দত্তের মাটিতে এবং দুই বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলকে তোলপাড় করা ফজলুল হকের নিজভূমে জন্ম নিয়েও নিজেকে যারপরনাই দ্যুতিময় করে তুলেছেন তিনি। শূদ্রত্বের নিরন্তর অহম নিয়ে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া খেয়ালি-তেজি যোগেন বরিশালের একটি স্থানিক বিন্দু থেকে নিখিল ভারতবর্ষের এক বিরাট জ্যামিতিক চিত্রে রূপপরিগ্রহ করেছে। তিনি বাংলার এমনই এক 'ক্লান্ত-ক্লান্তিহীন নাবিক' যার হাতে প্রাণ পায় শূদ্রসমাজ। পকিস্তান-প্রস্তাবের সমর্থক হলেও যোগেন মুসলমান হয়ে যাননি! তথাপি, বর্ণহিন্দুরা তাঁকে বলতো 'যোগেন আলী মোল্লা'। নিজেকে হিন্দু নয়, সর্বদাই 'চাঁড়াল' হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর একটিই কাজ–স্বজাতির সম্মান বাড়ানো। একমাত্র যোগেনই এভাবে বলতে পেরেছেন–

'আমি শিডিউলও না, হরিজনও না। বামুন যদি তার জন্মপরিচয়ে বামুন হয়, আমিও তা হলে জন্মপরিচয়ে চাঁড়াল। চাঁড়াল হিন্দু নয়। হিন্দুকে রক্ষা করাও তার দায়িত্ব নয়। চাঁড়ালের তো অন্তত চাঁড়াল হওয়ার স্বাধীনতা আছে। ...শূদ্রদের ওপর আক্রমণ তাহলে রায়ট ছিলো না। সেটা ছিলো উঁচু জাতের ধর্ম পালন। ধর্ম পালনের জন্য বেশ্যাবাড়ির মাটি আর শূদ্রের রক্ত লাগে।'

যোগেন প্রসঙ্গে অবধারিতভাবেই চলে আসে অম্বেদকরের নাম। স্কুলের মাস্টাররা তাঁর বই-খাতা স্পর্শ করতেন না। মুখের অপবিত্র বাতাস শ্রেণিকক্ষকে অপবিত্র করবে! ফলে, শ্রেণিকক্ষ নয়, তাঁকে বসতে হতো বারান্দার এক কোণে। বোম্বের সিডেনহ্যাম কলেজে অধ্যাপনাকালে বর্ণহিন্দু ছাত্ররা তাঁর ক্লাস বর্জন করেছে। হাল-আমলের বিশিষ্ট কথাশিল্পী মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও হরিশংকর জলদাসকেও নানাভাবে অসম্মানিত হতে হয়েছে। অস্পৃশ্যদের প্রতি আপত্তিকর মন্তব্যের জন্যে অম্বেদকর নেহেরু-গান্ধীকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। দল-বল নিয়ে অস্পৃশ্যদের জন্যে নিষিদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। 'মূল নায়ক' ও 'বহিষ্কৃত ভারত' নামের দুটো পত্রিকার মাধ্যমে দলিত আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিলো, আত্মনির্ভরতা, আত্ম-উন্নয়ন এবং আত্মসম্মান। ব্রিটিশ-আনুকূল্য না পেলে এ আন্দোলন সফল হবে না ভেবে, তাদের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলেন। এজন্যে তাঁকে 'দেশদ্রোহী'র তকমাও দেওয়া হয়েছে। ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর লন্ডনে আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে অম্বেদকর দৃপ্তকণ্ঠে বলেন–

'কুকুর-বেড়ালও যে অধিকার লাভ করে, ভারতের শূদ্রদের তা-ও নেই। না তারা পায় হিন্দুত্বের অধিকার। না পায় ভারতীয়ত্বের সম্মান।'

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে অম্বেদকর ঝাঁঝালো কণ্ঠে গান্ধীকে বলেন–

'সংখ্যানুপাতে পার্লামেন্টে ও বিধানসভায় শূদ্রদের আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।'

এমন তেজী-শূদ্রঅন্তঃপ্রাণ নেতাই তো খুঁজছিলেন যোগেন। তাই তো, কংগ্রেসের বিরোধিতায় 'সংবিধান রচনা পরিষদের'-এর নির্বাচনে অম্বেদকর বম্বেতে হেরে গেলে যোগেন মণ্ডল রংপুর থেকে তাঁকে জিতিয়ে আনেন। এ কাজে যোগেনকে সহযোগিতা করেছেন খুলনার মুকুন্দবিহারী মল্লিক, ফরিদপুরের দ্বারিকানাথ বারুরী, টাঙ্গাইলের গয়ানাথ বিশ্বাস, রংপুরের নগেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং ক্ষেত্রনাথ সিংহ। কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও, যোগেন যদি অম্বেদকরকে সেদিন জিতিয়ে না আনতেন, তাহলে ভারতের সংবিধানে দলিতদের কোনোরূপ অধিকারই হয়তো থাকতো না!

নমঃশূদ্রদের জন্যে কাজ করবার লোভ যোগেনকে পেয়ে বসেছিলো। ক্ষমতায় না থাকলে কেউ কথা শোনে না। শুনলেও গুরুত্ব দেয় না, অগোচরে তাচ্ছিল্য করে। সরকার মানেই অপরিমেয় ক্ষমতা যার দাপটে অনেক উলট-পালট ঘটিয়ে দেওয়া যায়। এসব তাঁর ভালো করেই জানা। সে কারণেই, যোগেন কেবল এমএলএ হয়েই থেমে থাকেননি, মন্ত্রিত্বের দিকে ঝুঁকেছেন; একাধিকবার মন্ত্রীও হয়েছেন। তাঁর প্রবৃত্তিতে ছিলো ভীষণ রকমের তেজ। ফলে, গান্ধী, সুভাষ, জিন্না, হক, সারওয়ারদিকে নাজিমুদ্দিন সকলেই তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন।

অম্বেদকরের মতো যোগেনও বিশ্বাস করতেন নমঃশূদ্র ও মুসলমানের কমন শত্রু বর্ণহিন্দু। ইংরেজ ও ভারতীয়দের কমন শত্রু জার্মানির সহায়তায় সুভাষ বোস যেমন ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে জার্মানির সহায়তা নিয়েছেন, যোগেনও তেমনি বর্ণহিন্দু ও ভারতের কমন শত্রু মুসলিম

লিগের সহায়তা নিয়ে বর্ণহিন্দুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

শূদ্র-সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগেনের মন্ত্রী হওয়াটা অপরিহার্য ছিলো। জিন্নার প্রগতিশীলতায় বিশ্বাস রাখাটাও একটা সময় পর্যন্ত হয়তো ঠিকই ছিলো। যোগেনের মুসলিম লিগকে পুরোপুরি বিশ্বাস করাটা আমাদেরকে দ্বিতীয়বার ভাববার সুযোগ দেয়! বিশেষত, সারওয়ারদি-নাজিমুদ্দিন-লিয়াকতকে তিনি ঠিক সময়ে চিনতে পারেননি। কিংবা চিনেও অদ্ভুত কারণে চুপ ছিলেন! কিন্তু, লিগ যোগেনকে ঠিকই চিনেছিলো। এরকমের হিন্দু-নেতাই তো লিগের তুরুপের তাস! তারা বুঝেছিলো, যোগেনের সমর্থন না পেলে নমঃশূদ্র-প্রধান বরিশাল-খুলনা-যশোর-ফরিদপুর অঞ্চলকে পাকিস্তানভুক্ত করা যাবে না। নেয়াখালির হিন্দুনিধন-যজ্ঞ সম্পর্কে যোগেনের বক্তব্য ছিলো 'ওখানে কেবল বর্ণহিন্দুদেরকে হত্যা করা হয়েছে, নমঃশূদ্রদের নয়'। পরন্তু, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে তিনি একে বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে হিন্দুদেরকে বলেন, তারা যেন লিগকে ভুল না বোঝেন। যোগেনের এরূপ আচরণ হিন্দুসমাজকে, এমনকি ভিকটিম শূদ্রসমাজকেও ব্যথিত করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং পাকিস্তানে হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যোগেন মণ্ডলের অদূরদর্শিতা প্রমাণিত সত্য। এটা যখন বোঝলেন, তখন আর করবার কিছুই ছিলো না তাঁর। যে যোগেন পাকিস্তান সৃষ্টিতে অবদান রাখলেন, তাঁরই জীবননাশের হুমকি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। স্বপ্নের-দেশ পাকিস্তানে বসে পদত্যাগপত্র লেখবার সাহসটুকুও দেখাতে পারলেন না তিনি। ভারতে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন। কিন্তু, পাকিস্তানের হিন্দুদেরকে রেখে গেলেন বীভৎসতার মাঝে। ভারতে যেতে বাধ্য হওয়া এবং পূর্ব-পাকিস্তানে সংঘটিত '৫০ ও '৬৪-র দাঙ্গা এবং '৭১-এহিন্দুনিধনের ভয়াবহতা যোগেনের পাকিস্তান-প্রীতির ভ্রান্ততাকেই তুলে ধরে!

একথা অবশ্যই ঠিক, শুধু হিন্দুত্বের নিরিখে যোগেনের মতো বিরাট ব্যক্তিকে বিচার করা সমীচীন নয়। ব্যক্তিগত লাভালাভ কিংবা মুসলিম লিগের এজেন্ডা বাস্তবায়ন তাঁর টার্গেট ছিলো না। তিনি যা করেছেন, শূদ্র-সমাজের ভালোর জন্যে করেছেন। ঝানু রাজনীতিজ্ঞরাও অকস্মাৎ হোঁচট খান। যোগেনের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছে। তাঁর অবস্থা কিছুটা যেন মহাভারতের কর্ণের মতো। আত্মপরিচয় পেয়েও কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, নিজের শপথ-ধর্মের স্বার্থে। যোগেন লিগের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন নিজের শূদ্র-ধর্মের স্বার্থে। প্রকৃতপ্রস্তাবে, দুজনেই নিজেদের অবস্থানজনিত ভুল সম্পর্কে উপলব্ধ হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে কর্ণের স্বীকারোক্তি এবং যোগেনের স্বপ্নের পাকিস্তান-ত্যাগ তার প্রমাণ।

দেশভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, সমকালীন ইতিহাস ও রাজনৈতিক চালচিত্রের উপন্যাসন ঘটিয়ে দেবেশ রায় 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' লিখেছেন। প্লট-বিস্তারণের মাধ্যমে জীবনের ডিসকোর্স, মানুষের হাল-হাদিস, সমাজের তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখকে দীর্ঘতর বাক্যের সাহায্যে তিনি তুলে ধরেছেন এতে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মতো ডিটেইল করে, দেবেশ রায় এতোটাই দরদ দিয়ে যোগেনকে উপস্থাপন করেছেন। যোগেন যেন তাঁর চোখের সামনে বেড়ে ওঠা চিরসঙ্গী; সামান্যতম আড়ালাটুকুও যেন দুজনাতে ছিলো না। যথার্থ বিশ্বনাগরিক হয়েও উপন্যাসটিতে তাঁর স্থানিক-ভাবনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর। দেবেশ রায়ের চোখে আমরা বরিশালকে নোতুন করে আবিষ্কার করি। যোগেন যেন দেবেশের মানস-নায়ক। 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' উপন্যাস ভারতবর্ষের দলিত-সমাজের উদ্দেশে লেখকের তর্পণ-স্বরূপ যেন।

উপন্যাসটিতে দেবেশ রায় যোগেন-ভাঁজ যেন পুরোপুরি খুললেন না। '৪৬-এর ১৬ আগস্ট কোলকাতা-দাঙ্গার জন্যে মৌলানা আজাদ এবং 'Statesman' পত্রিকা সারওয়ারদিকে দায়ী করলেও লেখক এ প্রসঙ্গে নীরব রইলেন! নোয়াখালি-দাঙ্গার ভয়ংকরতা এবং তাতে যোগেনের ভূমিকা সম্পর্কে কৌশলী হয়েছেন? ১৬ আগস্টের 'ডিরেক্ট অ্যাকশন ডে'-রময়দান-সমাবেশে সারওয়ার্দি বক্তব্য রাখেন। যোগেন তাঁর পাশেই ছিলেন। কম্যুনিস্ট পার্টিও একে সমর্থন করে। আবাল্যের কম্যুনিস্ট-চারিত্র্য, অধিক মাত্রায় যোগেন-প্রীতি এবং ধর্মীয়-সম্প্রীতি বিনষ্টির আশঙ্কা থেকে দেবেশ রায় হয়তো-বা ইতিহাসের এ অংশটিকে পাশ কাটিয়ে গেছেন! উল্লেখ করতেই হয়, খুশবন্ত সিং-এর 'ট্রেন টু পাকিস্তান' ও কিষণ চন্দরের 'গাদ্দার'-এর সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে পাক-হায়েনার নিষ্ঠুরতার বিবরণ কি তবে এসমস্ত লেখকের সাম্প্রদায়িক-মানসকে তুলে ধরে? এমনকি, লেখক নিজেও 'উদ্বাস্তু' গল্পে এনামুলের সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার বিবরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে সে অণিমাকে কুমকুম বেগমে পরিণত করেছে। তাতে, তিনি কি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেলেন? মোটেই তা নয়।

'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' গ্রন্থটি সম্ভবত দেবেশ রায়ের সাহিত্যিক-প্রতিভাকে সম্যকরূপে উপস্থাপন করে না। বইটি যতোটা না উপন্যাস, তার চাইতে বেশি ইতিহাস হয়ে উঠেছে। এ ইতিহাসেও আবার রয়েছে লুকোছাপা, খণ্ডতা ও প্রক্ষিপ্তি! বইটিতে ব্যবহৃত বরিশালের আঞ্চলিক ভাষা মোটেই যথাসই নয়–কৃত্রিমতায়-মোড়া, আরোপিত-ঢঙের। সংলাপ কথাশিল্পকে সজীব করলেও 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'-কে কিছু ক্ষেত্রে নিষ্প্রভ করেছে। ফলে, বইটি শেষতক সুখপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। •

চৈতন্য চন্দ্র দাস
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর

ঘটনাপঞ্জি ❖ ডিসেম্বর

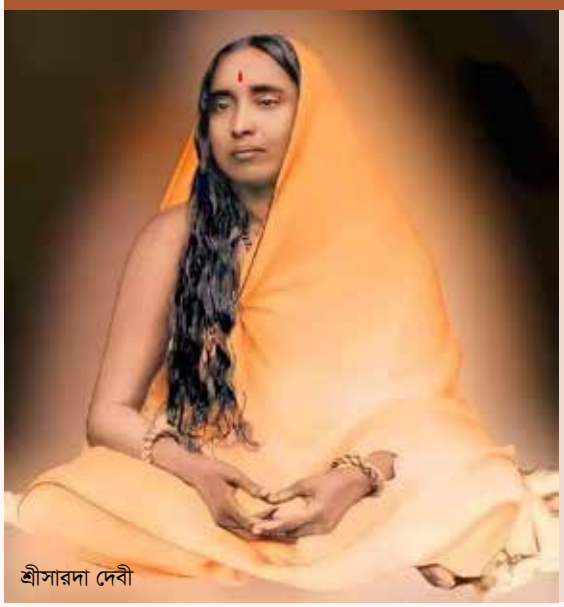

শ্রীসারদা দেবী

৩ ডিসেম্বর ১৮৮২	: শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জন্মদিন
৩ ডিসেম্বর ১৮৮৯	: বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম
৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬	: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু
৭ ডিসেম্বর ১৮৭৯	: বিপ্লবী বাঘা যতীনের জন্ম
৮ ডিসেম্বর ১৯০০	: উদয়শংকরের জন্ম
৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬	: কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর জন্ম
৯ ডিসেম্বর ১৮৮০	: বেগম রোকেয়ার মৃত্যু
১১ ডিসেম্বর ১৯২৪	: সাহিত্যিক সমরেশ বসুর জন্ম
১১ ডিসেম্বর ১৯৩৫	: রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির জন্ম
১১ ডিসেম্বর, ২০০৬	: বিনয় মজুমদারের মৃত্যু
১২ ডিসেম্বর ১৮৮৭	: অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজের জন্ম
১২ ডিসেম্বর ১৯০৫	: সাহিত্যিক মূলকরাজ আনন্দের জন্ম
১২ ডিসেম্বর ১৯৫০	: অভিনেতা রজনীকান্তের জন্ম
১৩ ডিসেম্বর ১৯০৩	: শিবরাম চক্রবর্তীর জন্ম
১৪ ডিসেম্বর ১৯২৪	: অভিনেতা রাজ কাপুরের জন্ম
২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩	: শ্রীসারদা দেবীর জন্ম
২৪ ডিসেম্বর ১৯২৪	: প্লেব্যাক গায়ক মহম্মদ রফির জন্ম
২৮ ডিসেম্বর ১৯২২	: সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর জন্ম

দিলারা হাফিজ

বিচূর্ণ কাচ

১.
প্রেমকে নিজের মনে করে কুক্ষিগত করো না,
প্রেম হলো ভূমি-শাসিত জল
ছাড়িয়ে যাও তাকে, ছড়িয়ে দাও–দেহাতীতে।
জেনে তুমি খুশি হতেই পারো–
ঈশ্বর থাকেন এই শস্য অঞ্চলে–

২.
যার পূর্ণতা নেই, তাঁকেও কাছে রেখে দাও,
কখনো সে পূর্ণ হতেও তো পারে!
অন্য এক জন্মান্তরে...

৩.
ভালোবাসা হোক সঙ্গীতময়,
অশরীরী সুরের নাচন!
কথার জলে ভাসাও তাকে
ডুবাও দেহের আবর্তন।

৪.
একটি প্রলয় সন্ধ্যা,
চোখের তারায় জ্বলতে থাকে,
অনার্য অগ্নিতার যতবার নেভাতে চাই,
জমে ওঠা অপরাপর সন্ধ্যার বিতর্ক
ভস্ম করে দেয় সকল আরতি আমার!

তিলোত্তমা বসু

মেলাতে

মেলাতে ঘুরতে এসে দেখি বেরোবার পথ
নেই কোনোখানে আর।

কেবল বিস্তার–
এই মেলা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে...

চারদিকে প্রদর্শনী,
কাঁথাকাজ–শো-অফ টাঙানো,
মুখেরা সাজানো পরিপাটি
কথারা কাঠের আর সেই কাঠে ছবি আঁকা,
কারুকাজ করা...

আবেগে লাগাম টানি,
লুকিয়ে ফেলেছি দুঃখ আর কালশিটে দাগ!
আমাকে জানাতে হবে 'ভালো আছি'
আমাকে জানাতে হবে
প্রতি রাতে চাপা কান্না বালিশের নিচে রেখে
সামাজিকভাবে শুভরাত

এ সমাজ আদালত আবার কখনো
প্রেমের কারণে ছি ছি–রায় দেবে
ভেঙে দেবে ডানা

বিপদে তোমার কোনোদিন
পাশে থাকবে না...

সৈকত রহমান

বুড়ো আমপাতা

বুড়ো আমপাতা তোমার ঝরে পড়া
কম কিছু সৌন্দর্য নয়।
ঝরে পড়ো শরতেরই কোল-কমলে।

অনেক পুরোনো হয়েছে
চোটে গেছে নীল আকাশি রংটা
একটি বোতামও কবে খসে গেছে,
তবু এতটুকু ভালোবাসা কমেনি।
তাই, ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিচ্ছি শার্টটা।

পেঁপেগাছ রুয়ে দিচ্ছি,
গতবারের গাছটায় এই বেলা বড়ো
ফলন হয়ে, গোটা গোটা পেঁপে ধরেছে।
দুপুর ওয়াক্তের ভর্তা হবে
ভাত হবে
মুগডালের কয়েক চামচ
কালিজিরা ভাজা রবে।

বুড়ো আমপাতা। তোমাকে নিয়ে
শিশুরা বেলগাছের তলায় ব'সে
বানাচ্ছে তাদের খেলার স্কুলের খাতা।

ঝরে পড়া কম-কিছু সৌন্দর্য নয়,
ঝরে পড়ো শরতেরই কোলে
বুড়ো আমের পাতা।

হেনরী স্বপন

শিউলির ঘ্রাণ

উৎসব এলেই প্রহেলিকা
তোলে শিউলির ঘ্রাণ

কোথায় চশমা,
কার গায়ে টেলকম পাউডার
মাখে, আঁশ চুলে গন্ধরাজ তেল
ঠাকুমার থান শাড়ি ওড়ে

বকের পালক–

উৎসব এলেই অনেক ধোপার কাপড়
ঘরে আসে ফের।

মোস্তাক আহমাদ দীন

মনচিঠি

বাক্সে ফেলেছি কবে, এলোবর্ণে, প্রাচীন নিয়মে; আমি জানি এই চিঠি কোনোদিন কারো হাতে যাবে। নাগরী হরফে লেখা পত্রখানি গূঢ়খামে ঢাকা, তার গায়ে লেগে আছে সোনা-রুপা জল। ভালো হয় এই চিঠি শেষমেশ কারও হাতে গেলে, প্রাপিকা বৈদেশি হলে অতীব উত্তম, এলো আর মেলোবর্ণ প্রাণ পায় অশ্রুভেজা চোখ পড়ে নিলে সযত্নে লিখেছি বটে, তবু এ মনের চিঠি, ভাবি আমি, কারও যেন সংসারে না-লাগে। তারচেয়ে বাক্সে থাকো, একা একা, শরতের মেঘ; নিবিড় রসিকা পেলে কোনো পৌঁছে যাবে প্রাণের খোয়াব

বাপি গাইন

এই জাদুঘরে

শিরদাঁড়ার কথা নয়
স্পর্শমাত্র ঠোঁট নিভে যাবে
এ শহরে প্রতি ইট
বন্ধুত্বের গ্রাম ছিঁড়ে খাবে।

তুমি তো নতুন মুখ
এই জাদুঘরে অশ্রু রেখেছ
লেখোনি কী ভীষণ এই
স্বপ্ন থেকে জ্বর এসে যেত?

সারারাত পাখি পোড়ে
পোড়ামাংস খায় কারা এত
তোমার জ্বরের দেশে
মৃত্যুশোকও দেদার বিকোতো।

সুজালো যশ

কেন্দ্র বরাবর সুড়ঙ্গটির নাম পৃথিবী

আঁতগুলো খনন শেষে পেয়েছিলাম ভূতলজুড়ে অন্ধকার। ডোপামিনরা বোতামবদ্ধ গলায় গাইছে বেগুনি বিড়ালের কয়েকটি কর্কশ গান। দৃশ্যত সেসব কি মাতৃত্বের সমাধি? যেখানে পৌঁছে চিরকালের জন্য আটকে আছি ধোঁয়াশাভরা অসুখ নিয়ে–আর কতদূর, বলতে বলতে ব্যান্ডেজে মোড়ানো সুটকেস থেকে বেরিয়ে এলো হাজারো ঘুমন্ত আলো। উল্লাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে বদলে যাচ্ছে গতজন্মের লিপিমালা। গুল্মবিষয়ক কনফারেন্সে বলি এই তো সেই হীরা-জহরত; যাদের ষড়যন্ত্রে পূর্বমায়েরা আপলোড করে গেছেন গুপ্ত গ্রহে বসবাসের গোপন ভাষা ও সংগীত।

মতিন রায়হান

বিন্দু বৃত্ত ও জীবনের গল্প

কোনো কোনো মানুষ চিরজীবিত
জীবন্মৃত অনেকেই
কেউ কেউ টেনে যায় অন্যের জীবন
ঠিক যেন কলুর বলদ
কিছু কিছু জীবনের কাছে বিপুলা পৃথিবী
চিরায়ত সবুজের হাতছানি
জ্বলন্ত নগরে কারা লেখে বিস্রস্ত জার্নাল?
পাঠক্লান্ত চোখ নিমেষেই ডুবে যায়
অতলান্ত অন্ধকারে!
যে হাত তুমুল উচ্ছ্বাসে টেনে নেয় কাছে
তাকে কেন অকারণ ঠেলে দাও দূরে?
তবে দূরও যে কখনো কখনো হয়ে ওঠে
গভীর আপন
সুর ভাঁজে প্রদীপ্ত আলোয়...
সজল মেঘের কাছে জল চেয়ে
খালি হাতে ফেরে না তো কেউ
তোমার তৃষ্ণাও মিটে যাবে অনায়াসে
ভালোবেসে শুধু একবার হৃদয় বাড়াও!

যে হৃদয় প্রতিদিন গেঁথে রাখে স্মৃতিরাশি
তাকে ঠিক তুলে রাখি গোপন সিন্দুকে
স্মৃতিরা তো ঘোরলাগা পরিযায়ী পাখি
ডানার ঘূর্ণনে আঁকে রোজ
বিন্দু থেকে বৃত্ত রাশি রাশি!

সৈকত ঘোষ

সার্কাস

পাতাল ফাটিয়ে উঠে এলো যে চাঁদ
তার টুপি খুলে নিয়েছে পরাবাস্তব,
ব্যক্তিগত স্পেস-স্টেশন থেকে সংকেত আসছে
বড়ো বিপজ্জনক এ উচ্চাকাঙ্খার স্ক্রিনশট

আমি দেখি অন্ধকার বিক্রি করছে আলোর মেহফিল
আমি দেখি একটা সময় পর মুখোশও মুখ হয়ে যায়
যাবতীয় উলাস আত্মনির্মাণের মোরাম বিছিয়ে দিয়েছে
স্থাবর অস্থাবর ভাঙা জ্যোৎস্নার গান

অন্ধকার জেগে আছে অন্ধকারের ভিতর
তার ভিতর দ্বিধাহীন জীবন্ত সার্কাস
সমস্ত বিস্ময় ফাটিয়ে, ব্যর্থতা ফাটিয়ে
এগিয়ে চলেছে পৃথিবী সাইকেল, মেহনতের শবরীমালা

শাহ্‌নাজ মুন্নী

কৃতজ্ঞতা

ওরা অপমানের বল্লম দিয়ে খোঁচায়
একটা ঘন সবুজ ভালোবাসার ঝোপ আমাকে লুকিয়ে রাখে
ওরা বিদ্রুপের ছোরা দিয়ে আঘাত করে
আমি পিঠ পেতে কষ্টগুলি গিলতে গিলতে
বোমার শব্দে আতঙ্কিত শিশুটির হাত ধরে রাখি
রাত্রি আঁধার হয়ে এলে ক্ষতক্লান্ত রক্ত জর্জরিত হৃৎপিণ্ড থেকে
একটা একটা করে বিষমাখা তির খুলে আনি
ছোট্ট বলয়ে বিন্দুর মতো ঘুরে ঘুরে নাচি
মাথার উপরে ঝলসে ওঠে ঈর্ষার বাজ
পায়ের নিচে অক্ষমেরা ছুড়ে দেয় ভাঙা কাচ
তবু নূপুর ফিনকি দিয়ে বাজে
থামে না সুফিদের মতো ঘোর লাগা ঘূর্ণায়মান নাচ
ক্ষমার জল দিয়ে নিক্ষিপ্ত কাদা ধুয়ে নিই
তোমাদের দেওয়া যাতনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকি
পরাজিত নই, তবু শীতের রোদের মতো কুয়াশার কাছে হার মেনে আছি
আমি এক সন্তুষ্ট গ্রহ নিজস্ব নক্ষত্র ঘিরে নিঃশব্দে বাঁচি।

ফারুখ সিদ্ধার্থ

জলকাদার স্বাদ

কীর্তিমানরাও অপচয় করার মতন কিছু সময় হাতে রাখেন

আমি তো তেমন কেউ নই, কেন রাঙাব না যুগল পা
যারা আ-বছর থাকে উদ্‌গ্রীব তোমার পথেই
হেঁটে হেঁটে ঘাটপাড়ের পচপচে কাদায় ফের ডোবাতেই

প্রিয় জন্মগ্রাম আমার, বন্য ফুলে ফুলে তুমি
আজও কি হয়ে ওঠো গোয়াল সাজানো ছেলেবেলা
মা-হাতের মিষ্টান্নয় সবান্ধব মেতে-ওঠা উৎসব কলাপাতায়

প্রয়োজনহীন সব সম্পর্কই কংক্রিট, ছোঁয়ার ওপারে

এত ঘাঁটাঘাঁটি, তবুও অন্তর্জালে তোমার
হাড়ুলিয়া-চাপুলিয়া-দিঘলিয়ার জলকাদার স্বাদ তারা পায় না

প্রবাসে, নগ্ন-পা তবু জেগে জেগে তোমাকেই প্রদক্ষিণ করে

শফিউল শাহিন

অন্ধকার

অন্ধকার আকাশে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ
নক্ষত্রের সাদা গোলাপ ফোটে নাই আজকে
জ্যোৎস্নার সুগন্ধও নেই চারদিক।
নেই কোনো জোনাকের দৈববাণী
সতেজ বাল্বও বলছে প্রথাবিরুদ্ধ।
এই ঝরনাও পাথরের কান্নায় হয়ে আছে লবণাক্ত
শস্যখেতও তেমন একটা শিহরিত নয় আজকে
গৃহপালিত চাঁদ কোথায় ঝরাচ্ছে তার শর্করা?

বিনয় বর্মন

সুতা আবিষ্কার

তুলো প্ররোচিত করেছিল বাতাসকে
সূক্ষ্ম হাসি, জ্যোৎস্নাবিভ্রম
আঙুলে বাঁধা দূর ছায়াপথ থেকে আগত রশ্মি
গ্রহনক্ষত্রের পুতলনাচ শুরু

হাসিকান্নার মালা ঝোলে বৃক্ষের গলায়
কার দৃষ্টির মাছ ধরা পড়ল বড়শিতে?
বরফ সেলাই করে বানাও কম্বল
লজ্জা ঢাকো রেশমে পশমে

শুধু এইটুকু নয়
আরও গাঢ় প্রয়োজনে সুতার আবিষ্কার
তবে এর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার
বাঁধনহারা হৃদয় বাঁধতে।

বাদল ধারা

আয়রন অক্সাইড

আগুন নিদ্রাম ~ ভূতাত্ত্বিক কাল ~ ঐ শীতল নক্ষত্র
আয়রন অক্সাইড ~ উস্কে দিচ্ছে ~ মহাজাগতিক ক্ষত

অদ্ভুতুড়ে তাড়না অন্তত স্ফীতির দিকে ~
যৌনসংকেত ~ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে

নিভে যাবার পূর্বে ~ আরও কিছু দৃশ্য ~ অন্তঃস্থ করে নেও

১। অরণ্য ছিলো ~ মাছ ছিলো ~ ছিলো পশুপাখি
২। যাকে ভাবো কাক ~ সে তো ভিনগ্রহে উড়াল দেয়নি
৩। মানুষ হারিয়ে ~ নিঃসঙ্গ এক ~ শূন্য দৃষ্টি

৪, ৫, ৬, ৭, আরো কিছু ~ সংখ্যার দিকে যাওয়া যাক

মনিরুল মোমেন

থাকা না থাকা জুড়ে

খুব বেশি একা হলে সমাগম বেড়ে যায়।
চিলেকোঠায় মিশে থাকা শেওলাকুঁড়ি
পাতানৃত্যের কারিশমা দেখায়।

যে ছিল–ছিল না যে কোনো দিন
তার–
তাদের
কী উদ্দাম বেড়ে ওঠা....

যা কিছু স্বাপ্নিক–অনূর্ধ্ব করাতের কচকচ
থাকে কিছু, থাকে না কতকিছু!

এইসব না থাকা জুড়ে
থাকাজনের কতশত চুপচাপ!

আতিক আলতাফ

ঋণ

যেন বসে আছি আমি এক যান্ত্রিক জীবনে
কখনো গা এলিয়ে দেই হেলানো আয়েশি সিটে,
কখনো চোখ রাখি, খোলা জানালায় শূন্যে
জীবন ছুটে চলে, অযান্ত্রিকতা ডাকে পেছনে।

অসংখ্য চোখের চাহনি, আমি যাই এড়িয়ে
পড়তে পারিনি বা ইচ্ছে করেই চাইনি বুঝতে
এভাবেই পেছনে পড়ে যায় অসংখ্য জীবন!
যেভাবে দুধারে বাড়ন্ত গাছ বনসাঁই করে দেই।

শৈশবের স্টেশনে আর ফেরা হয় না বহুদিন
আমার কাছে তাঁদের প্রত্যাশা কি জানা হয়নি
যান্ত্রিক বাস তবু ছুটেই চলে ভবিতব্যের গন্তব্যে
আর বেড়ে যায় আমার কত অপত্যস্নেহের ঋণ!

দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

ঝড়ের জায়গায়

ঝড়ের জায়গায় প্রেম রাখতে এসেছি।
ঝড় যেসব জিনিস ভেঙে দিয়েছিল
প্রেম সেই সব মেরামত করবে।

ভাঙা ডালের জায়গায় হাত রাখতে এসেছি
ভাঙা ডালটা তুলে বাইরে ছুড়ে দেবো
আর সেখানে নতুন গাছ লাগাবো।

কাচের চূর্ণের জায়গায় হৃদয়ের গুঁড়ো
রাখতে এসেছি।
অন্ধকারের জায়গায় চোখের আলো।
এখানে বিধ্বস্ত যে পথ শূন্য
সেইখান থেকে আবার চলা শুরু হবে।

এখন যে ছবিটা আঁকা
তা ভাঙা বাড়ি।
সেখানে স্বপ্ন রাখতে এসেছি
নির্মাণ রাখতে এসেছি।

সুমন মল্লিক

স্মরণের ঢেউ

অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি এল– মহানন্দায় তখন জলোচ্ছ্বাস–

হিলকার্ট রোডের ফুটপাতে একছাতার নিচে
ধীরতম গতিতে হেঁটেছিল অদৃশ্য আদিগন্তে দুটি ভুল–

থেমে থেমে আলোর ঝলকানি– বজ্রবিদ্যুৎ–
ভয় নয়, ভ্রম ছিল শুধু– মাঝখানে ব্যবধান একচুল–

মৌনতা ভাঙেনি– আকাশে ওড়েনি রংধনুর চাদর–
কেন দেখি ভ্রমরকৃষ্ণ শাড়ি! কেন শুনি তার কণ্ঠস্বর!

কে কাকে কীভাবে এঁকেছি, কে কাকে কীভাবে রেখেছি
তা জানি না আমরা কেউ– এখন শুধু স্মরণের ঢেউ
আর তার মাঝখানে দুটি ভুল, একটি বৃষ্টিস্নাত ভাদর–

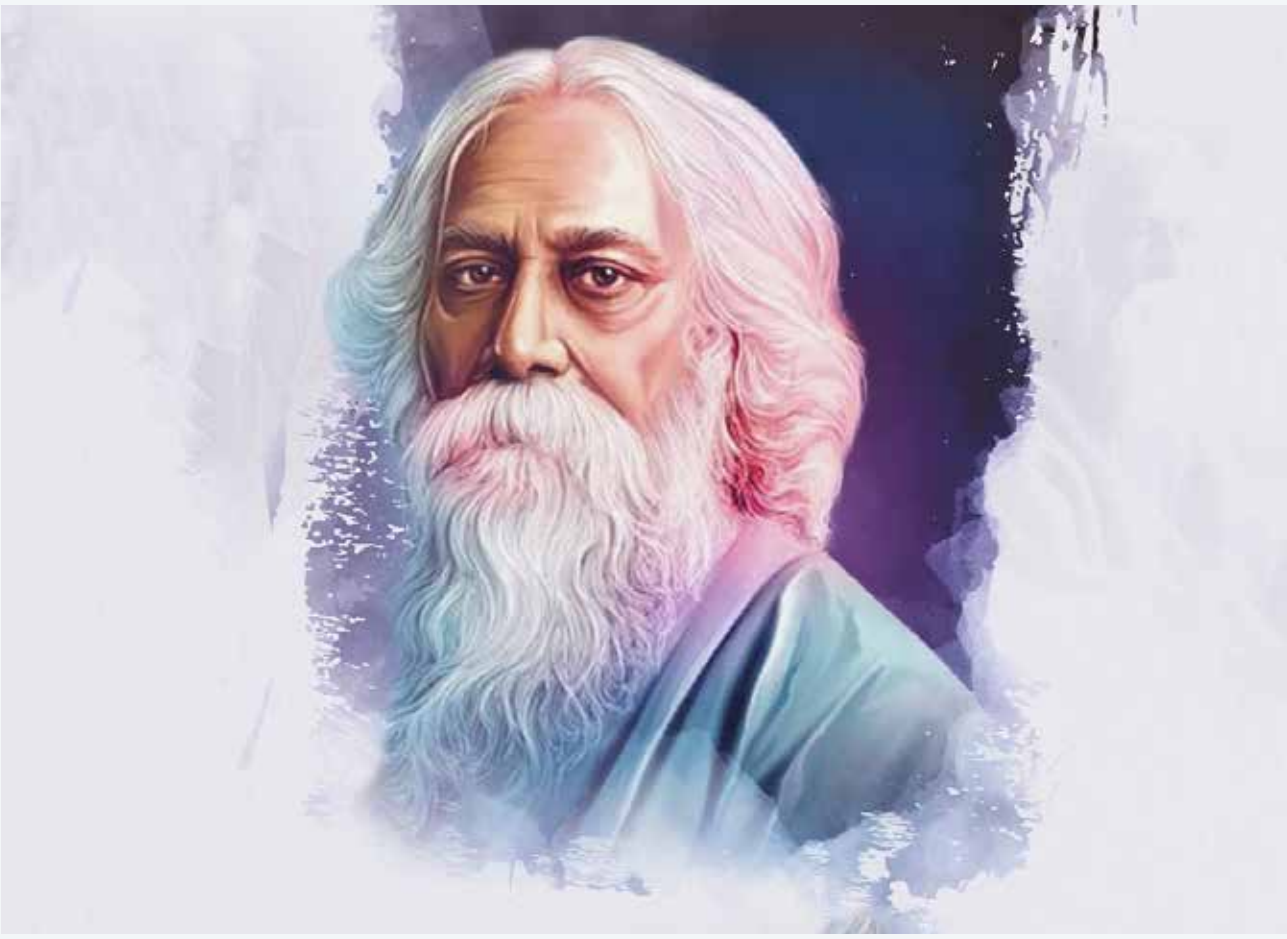

গ্রন্থশতবর্ষ

‘রক্তকরবী’ : শতবর্ষ ফিরে দেখা

আবু সাঈদ তুলু

১৩৩১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকটি প্রকাশিত হয়। রচনার সময় ধরে এবছর ‘রক্তকরবী’ নাটকটি শতবর্ষ অতিক্রম করতে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের এ নাটকটি ছিল একটু ব্যতিক্রম। গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য ধারার আঙ্গিকের ছাপ কাটিয়ে এ নাটকটি প্রথা বিরোধিতার কথা বলে। যখন বিশ্বব্যাপী যান্ত্রিক সভ্যতায় অস্থির, ঠিক তখনই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ ‘রক্তকরবী’ নাটকটি যান্ত্রিকতার বিপরীতে মানুষের প্রাণের কথা-আত্মার আনন্দের কথা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে একমাত্র এই নাটকটিই রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে মঞ্চস্থ হতে পারেনি। সে নিয়ে ভীষণ খেদ ছিল রবীন্দ্রনাথের মনে। কিন্তু কেন? একসময় যে নাটককে দুর্বোধ্য বলে সবাই পরিত্যাগ করেছিল কালের স্রোতে আজকের ভারত ও বাংলাদেশ এ ‘রক্তকরবী’ নাটকই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ ‘রক্তকরবী’ নাটকটিই মানবিকতা-বুর্জোয়া-শ্রেণিদ্বন্দ্ব-সমাজ-রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আসীন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা। বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো শাখা নেই যেখানে তিনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেননি

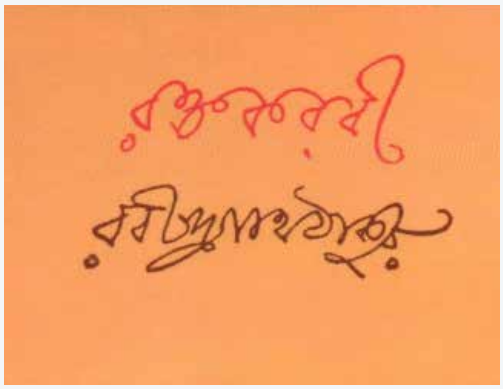

‘রক্তকরবী’ নাটকের কাহিনি একটি যক্ষপুরীকে কেন্দ্র করে। এ যক্ষপুরী রূপক বা প্রতীকী। এখানে শ্রমিকদল যন্ত্রের মতো সারাক্ষণ দলা মাটির তলা হইতে সোনা তুলবার মতো ক্লান্তিকর কাজে ব্যস্ত। এখানকার প্রধান বা রাজা সবার সামনে আসেন না। জালের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেন। জালের আবরণের বাইরে নাটকের সমস্ত কাহিনি সংঘঠিত

তাঁকে কেন্দ্র করেই এসময়ের সাহিত্যধারাকে তাত্ত্বিকরা রবীন্দ্রযুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কবি হিসেবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে সারা পৃথিবীতে নাম কুড়িয়েছেন। সংগীত, উপন্যাস, ছোটগল্প প্রত্যেক শাখাতেই তিনি ভাস্কর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যসাধনায় পাঠককে জীবন-জগৎ ঘিরে যে সৌন্দর্যে ভাসিয়েছেন তা অকল্পনীয়। জীবনের শেষ পর্যায়ে ঝুঁকেছিলেন ছবি আঁকায়। সেখানেও অমৃতের সন্ধান দিয়েছেন সমঝদারদের। অন্যান্য শাখার মতো নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। বরং নাটকে গীতি, বস্তুবাদী, হাস্যাত্মক, রূপক-সাংস্কৃতিক তত্ত্বমূলক নানানাটক রচনার মধ্য নিয়ে বাংলা ভাষার নাট্যধারাকে নিয়ে গেছেন উচ্চাঙ্গে। যাত্রাশিল্পে নিরাভরণের মতো বাঙালির নাট্যরীতিকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন। একদিকে আধুনিকতাকে যেমন ধারণ করেছেন তেমনি আবার মুক্তোর মতো ছেঁকে এনেছেন আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে হাতেখড়ি হয় তার বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে দিয়ে। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘এমন কর্ম্ম আর করবো না’ নাটকে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যজগতে প্রবেশ করেন। তখন তার বয়স ছিল ১৬ বছর। এ নাটকটির নাম পরবর্তীতে পরিবর্তন করে হয়েছিল ‘অলীকবাবু’। রবীন্দ্রনাথ অলীক বাবু চরিত্রেই অভিনয় করেছিলেন। এর নাটকের আরেক কেন্দ্রীয় হেমাঙ্গিনী চরিত্রে অভিনয় করেছেন বৌঠান কাদম্বরী দেবী। রবীন্দ্রজীবনীকার অনেকেই দাবি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় অভিনীত নাটক ‘মানময়ী’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাত থেকে ফেরত এসে প্রথম নাটক রচনায় হাত দেন। তার রচিত প্রথম নাটক ‘বাল্মীকি প্রতিভা’। ১৮৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখ জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে প্রথম অভিনয় সম্পন্ন হয়। এতে বাল্মীকি চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে অভিনয় করে। তার একে একে রচনা করেন কালমৃগয়া (১৮৮২), মায়ার খেলা (১৮৯০) প্রভৃতি। কবিতা-উপন্যাসের পাশাপাশি নাট্য সাহিত্যেও বিশেষ অবদান রাখেন। রচনা করেন কালজয়ী নাটকগুলো–রাজা ও রানী, গোড়ায় গলদ, বিসর্জন, বৈকুণ্ঠের খাতা, রাজা, শারদোৎসব, অচলায়তন, ফাল্গুনী, ডাকঘর, বসন্ত ইত্যাদি নানা নাটক। রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত অভিনয়ও করতেন। বিসর্জন নাটকে যৌবন বয়সে অভিনয় করেছিলেন রঘুপতি চরিত্রে, মধ্য বয়সে এসে অভিনয় করেছেন জয়সিংহ চরিত্রে।

১৯২৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি বসন্ত নাটকটি কলকাতার মঞ্চস্থ হয়। এ সময় ১৩ বৈশাখ ১৩৩০, ২৬ এপ্রিল ১৯২৩ গ্রীস্মকালীন ছুটি হিসেবে শান্তিনিকেতন বন্ধ হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় বন্ধ হবার কয়েকদিন আগেই শিলং অবকাশে যান। কারণ ওই সময়টাতে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য তিনি ইংরেজিতে প্রবন্ধ লিখে ও বক্তৃতা করে নাভিশ্বাস হয়ে উঠছিলেন। ফলে অবকাশ যাপনটা অবশ্যম্ভাবী মনে করছিলেন। শিলং-এ জিৎভূম নামে এক বাড়িতে উঠেছিলেন। একটু দূরেই ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজার শৈলনিবাস। অপূর্ব সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে অবকাশ বাসের নিরালায় বসে ‘নাটক’ রচনা করেন। এর আগের বছর ইউরোপে গিয়ে পাশ্চাত্য যন্ত্রসভ্যতার ওপর কবির মনে বিশেষ বিরূপ মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। সেই ভাবেরই প্রকাশ ঘটে এ নাটকে। এ সময়ে এটি এক ভিন্ন ধরনের রচনা। ১৩৩০ সালের এ গ্রীষ্মকালীন ছুটির দুমাসের মধ্যে রচিত হয় এ অমূল্য নাট্যসম্পদ। রচনা শেষ করে নাটকটির প্রথমে নাম রাখেন ‘যক্ষপুরী’ তারপরে এর নাম পাল্টে রাখেন ‘নন্দিনীর পালা’ তারপর আবার পরিবর্তন করে এর নামকরণ করেন ‘রক্তকরবী’। বইখানি অনেক কাটাকাটির পর প্রায় দেড় বছর পর ১৩৩১ সালের আশ্বিন মাসে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ক্রোড়পত্র হিসেবে প্রকাশিত এ পত্রের সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৮৮। তারপর সে মাসেই ‘রক্তকরবী’ ইংরেজিতে Red Oleanders নামে বিশ্বভারতী কোয়াটারলিতে প্রকাশ পায়। এ নাট্যগ্রন্থটিকে এলমহার্স্টকে উৎসর্গ করেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ১৩৩৩ সালে প্রথম ‘রক্তকরবী’ নাটকটি প্রকাশ করে। প্রকাশক ছিলেন জগদানন্দ রায়। এ সংস্করণে প্রবাসী পত্রিকার পাঠ অনুসরণে ‘প্রস্তাবনা’ শীর্ষ ‘কবিভাষণ’ অন্তর্ভুক্ত হয়। মূল পাণ্ডুলিপি নির্মলকুমারী মহলানবিশের কাছে থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় এটিই ছিল একমাত্র সংস্করণ।

‘রক্তকরবী’ নাটকের নানা পাঠভেদ রয়েছে। এ নাটকে এসে জীবন সংস্কৃতির সামগ্রিকতার সম্মিলন ঘটেছে। রক্তকরবীর কাহিনিবিন্যাস একটি যক্ষপুরীকে কেন্দ্র করে। পৌরাণিক আখ্যানের শব্দ ‘যক্ষপুরী’ হলেও এটি তা নয়। এ যক্ষপুরী আধুনিক কালের দাসত্বের ঘেরাটোপ। এখানকার মানুষরা যন্ত্রের মতো কাজ করে। জীবনে আনন্দ-ভালোবাসা কিছুই নেই। যেখানে মানুষ নিরানন্দ-ভয়ার্ত জীবনের গ্লানি টানে।

‘রক্তকরবী’ নাটকের কাহিনি একটি যক্ষপুরীকে কেন্দ্র করে। এ যক্ষপুরী রূপক বা প্রতীকী। এখানে শ্রমিকদল যন্ত্রের মতো সারাক্ষণ দলা মাটির তলা হইতে সোনা তুলবার মতো ক্লান্তিকর কাজে ব্যস্ত। এখানকার প্রধান বা রাজা সবার সামনে আসেন না। জালের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখেন। জালের আবরণের বাইরে নাটকের সমস্ত কাহিনি সংঘঠিত। শুধু শেষ দৃশ্যে রাজা জালের আবরণ ভেঙে বাইরে চলে আসেন। খোদাইকরের দল যেন পৃথিবীর আনন্দ-স্ফুর্তির বাইরের জীব। তারা কেবল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গের ভেতরে কাজে ব্যাপ্ত থাকে। যক্ষপুরী গ্রহণলাগা পুরীর মতো। মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রাখাই এখানকার কাজ। এখানে শ্রমিকদের নাম হয় সংখ্যায়। যেমন- ৬৯৬। নাটকটি শুরু হয় কিশোর নন্দিনীকে খুঁজছে তার মধ্যে দিয়ে। নন্দিনী নামের এক প্রাণমূর্তিকে ধরে এখানে আনা হয়েছে। তার প্রতিটি ছন্দে-বর্ণে-অঙ্গে প্রাণ-আনন্দের জোয়ার। কিন্তু যক্ষপুরীর মানুষগুলো প্রাণহীন এক জীবনের আঁধার। নন্দিনী ভালোবাসে রঞ্জনকে। কিন্তু রঞ্জন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নন্দিনীকে ধরে আনা হয়েছে এখানে। নন্দিনীর প্রিয় রক্তকরবীর মালা। এ এক রক্তিম মুক্তি আনন্দের প্রতীক। প্রাণহীন এ ধ্বংসস্তূপে যেন নন্দিনী প্রাণের সঞ্চার।

এ নাটকের কেন্দ্রিয় চরিত্র নন্দিনী। নন্দিনী যে আলো। অন্ধকারের ভেতরে জীবনের আলো। নন্দিনী যে বিস্ময়ের আলো। তাই তো অধ্যাপক বলে, ‘সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে তুমি সেই আচমকা আলো।’ নন্দিনী যে রক্তকরবীর মালা পড়ে তাতে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। কেউ সে রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। প্রেমিক বিচ্ছিন্ন নন্দিনী যেন প্রাণহীন আচারসর্বস্ব জগৎকে ভেঙে দিতে

চান। তাই তো জালের আভরণে ভয়ংকর শক্তিরূপী আতঙ্কমূর্তী রাজাকে দেখতে চান। নন্দিনী রাজাকে ঘরের মধ্যে ঢুকে রাজাকে দেখতে চায়। এ সাহস যেন কখনো কারো হয়নি। নন্দিনী যক্ষপুরীতে প্রাণের আনন্দের প্রতীক হয়ে ওঠেন।

নাটকে কিশোর ভালোবাসে নন্দিনীকে। শত কষ্টেও রক্তকরবীর ফুল এনে দিতে পারলে কিশোর যেন আত্মায় আনন্দ পায়। বিশু গানের মতো সেও ভালোবাসা দিতে চায়। নন্দিনীর প্রাণচ্ছলে যক্ষপুরীর সবাই যেন পরিবর্তন হতে থাকে। 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে... আয় রে চলে/ আয় আয় আয়। ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে/মরি হায় হায় হায়।' পৌষের ডাকের মতো নন্দিনী রাজাকেও অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করতে চায়। কিন্তু রাজা কী যাবে? সে তো ভয়ংকর রূপেই থাকতে চায়। সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। এখানে প্রত্যেকটা মানুষই যেন ভয়ংকর। এমনকি অধ্যাপকও। অধ্যাপককে নন্দিনী বলে–

নন্দিনী : তোমাকে তো ভয়ংকর ঠেকে না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এরা আমাকে এখানে নিয়ে এল, রঞ্জনকে সঙ্গে আনলে না কেন।

অধ্যাপক : সব জিনিসকে টুকরো করে আনাই এদের পদ্ধতি। কিন্তু তাও বলি, এখানকার মরা ধনের মাঝখানে তোমার প্রাণের ধনকে কেন আনতে চাও।

নন্দিনী : আমার রঞ্জনকে এখানে আনলে এদের মরা পাঁজরের ভিতর প্রাণ নেচে উঠবে।

অধ্যাপক : একা নন্দিনীকে নিয়েই যক্ষপুরীর সর্দাররা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে, রঞ্জনকে আনলে তাদের হবে কী।

নন্দিনী : ওরা জানে না ওরা কী অদ্ভুত। ওদের মাঝখানে বিধাতা যদি খুব একটা হাসি হেসে ওঠেন, তাহলেই ওদের চটকা ভেঙে যেতে পারে। রঞ্জন বিধাতার সেই হাসি।

নাটকে অধ্যাপকও যেন পুথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলে। সেও যান্ত্রিক। অধ্যাপকও যেন নন্দিনীর ভালোবাসায় বিমগ্ন। তিনি বলেন–'আমরা নিরেট নিরবকাশ-গর্তের পতঙ্গ, ঘন কাজের মধ্যে সেঁধিয়ে আছি; তুমি ফাঁকা সময়ের আকাশে সন্ধ্যাতারাটি, তোমাকে দেখে আমাদের ডানা চঞ্চল হয়ে ওঠে। এসো আমার ঘরে, তোমাকে নিয়ে একটু সময় নষ্ট করতে দাও।

অন্যদিকে ফাগুলাল ও তার স্ত্রী চন্দ্রা–ফাগুলাল সারাক্ষণই মদ্যপ। সারাদিনই সে কেবল খেটে মরে। অপরদিকে বিশু পাগল সবাইকে গান শোনায়। বিশু পাগলকেও যেন নন্দিনীতে পেয়েছে, সে ওর প্রাণ টেনেছে, গানও টেনেছে। যক্ষপুরীতে নন্দিনী যেন আনন্দ কিংবা মুক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে।

বিশুর গান যেন জীবনের খোঁজেই পাগলপারা হয়–'ভালোবাসি ভালোবাসি'। যক্ষপুরীতে ঢুকলে সবার হাঁ বন্ধ হয়ে যায়, তখন জঠরের মধ্যে যাবার একটি পথ ছাড়া আর পথ নেই। একসময় যক্ষপুরীর কারিগরটা বন্দিশালা ভেঙে ফেলে। মানুষের মুক্তি যে সম্মুখে অববারিত রূপে দেখা দেয়। কেবল সংখ্যা ছাড়া মানুষগুলোর আর পরিচয় থাকে না। তিনশ একুশ- ঙ পাড়ার মোড়াল। সর্দারও চরিত্রও ভয়ংকর। তেমনি পুরাণবাগিশও যান্ত্রিক। আর সুড়ঙ্গ খোদাইকর গোকুলও তাই।

রাজা নিজেকে আড়াল রাখে তার শক্তিমত্তাকে বজায় রাখার জন্য। নিজের ক্ষমতা আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কিন্তু নন্দিনীর প্রাণস্পর্শে রাজা নিজের ধ্বজাকে ধরে রাখতে পারেন না–

'নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ ক'রে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।'

এক সময় রাজার সমস্ত বাধ ভেঙে যায়–

'আমি ক্লান্ত, ভারি ক্লান্ত। ধ্বজাপূজায় অবসাদ ঘুচিয়ে আসব। আমাকে দুর্বল কোরো না। এখন বাধা দিলে রথের চাকায় গুঁড়িয়ে যাবে।

নন্দিনী : বুকের উপর দিয়ে চাকা চলে যাক, নড়ব না।

নেপথ্যে : নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী : আমি চাই, সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি। ...

একসময় বন্দীশালাকে ভাঙতে এগিয়ে আসে ফাগুলাল, বিশু, চন্দ্রা, গোকুলসহ খোদকদল সবাই। রাজা উপলব্ধি করেন এ আমাদেরই তৈরি করা শৃঙ্খল। রাজা তখন বলে ওঠেন–'তোমাতে আমাতে দুজনে মিলে কাজ করতে হবে। একলা তোমার কাজ নয়। ...মরতে তো পারব। এতদিনে মরবার অর্থ দেখতে পেয়েছি–বেঁচেছি।' যক্ষপুরীর বন্দিশালী ভেঙে যেন জীবন আনন্দ প্রাণের মুক্তির সুর ঘোষিত হয়–'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে.. আয় রে চলে/আয় আয় আয়। ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে/মরি হায় হায় হায়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি তার জীবদ্দশায় শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়নি। নন্দিনী চরিত্রটি যার চঞ্চলতা ও প্রাণোচ্ছলকে কেন্দ্র করে রচনা করেছিলেন সেই শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় করা হয়নি। শান্তিনিকেতন পর্বে রচিত নাটকগুলোর প্রত্যেকটিই অভিনীত হয়েছিল এক 'রক্তকরবী' ছাড়া। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠিতে সে হতাশা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৩৩৪ সালের 'দি টেগোর গ্রুপ' নামে কলকাতার এক নাট্য সংগঠন নাট্য নিকেতন নামে রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনয় করেন। বিহার অঞ্চলে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিশির ভাদুড়িকেও পেশাদার মঞ্চে 'রক্তকরবী' মঞ্চায়নের দায়িত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু তা বাস্তবে সফল হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর ১৯৪৭ সারে 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম প্রযোজনা করেছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস। এতে রাজার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র। তবে, এ সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। ১৯৫৪ সালে শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় কলকাতার বহুরূপী নাট্যদল 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চে নিয়ে আসে। সে সময় নাটকটি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শম্ভু মিত্রের পরিচালিত এ নাটকে রাজা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন শম্ভু মিত্র নিজেই। নন্দিনী চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র, বিশু পাগল চরিত্রে শোভন মজুমদার, সর্দার চরিত্রে অমর গঙ্গোপাধ্যায়, গোঁসাই কুমার রায়। মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন খালেদ চৌধুরী ও আলোক পরিকল্পনা ছিলেন তাপস সেন। 'উচ্চাঙ্গ' 'দুর্বোধ্য', 'তত্ত্বনাটক' 'অবোধ্য' নামে আখ্যা দেওয়া এ নাটকটি ধীরে ধীরে গণমানুষের নাটক হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে অডিয়ো সিডি প্রকাশ করে। ফলে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছাতে থাকে নাটকটি। বাদল সরকারও ভিন্ন আঙ্গিকে 'রক্তকরবী' প্রযোজনা করেছিল। এর পর নানা নাট্যদলই 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ করেছে।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে ঢাকা সার্কেল ও বাংলা একাডেমিতে 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম নির্মিত হয় মুস্তফা মনোয়ারের প্রযোজনায়। বিটিভিতে প্রচারিত এ নাটকটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে সহজবোধ্য ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গ্রুপ থিয়েটারের দল হিসেবে নিয়মিত মঞ্চস্থ করে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় ও চট্টগ্রামের তীর্যক নাট্যদল। নাগরিক নাট্যসম্প্রদায় প্রযোজিত নাটকে নির্দেশনা দেন আতাউর রহমান। ঢাকার প্রাঙ্গণেমোর নাট্যদল প্রযোজিত 'রক্তকরবী'ও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। একাডেমিক পর্যায়েও 'রক্তকরবী' একাধিক বার প্রযোজিত হয়েছে। সম্প্রতি নানা দলই এ নাটকটি প্রযোজনা করে চলেছে। বাংলাদেশে বর্তমান 'রক্তকরবী' নানা নিরীক্ষা ও প্রযুক্তিগত নানা উৎকর্ষে নানা ব্যঞ্জনায় প্রতিনিয়ত উপস্থাপিত হচ্ছে দর্শকদের সামনে। •

তথ্যসূত্র

১) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, ১৩৪৩

২) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিতৃস্মৃতি, কলকাতা, ১৩৭৮

৩) প্রশান্তকুমার পাল, রবীজীবনী, ১ম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা

৪) রতন সিদ্দিকী, নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা

৫) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' বিশ্বভারতীয় পাণ্ডুলিপি সংবলিত সংস্করণ, শান্তিনিকেতন, ১৪০৫

আবু সাঈদ তুলু
প্রাবন্ধিক

সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ও ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন

গ্রন্থশতবর্ষ

মৈমনসিংহ গীতিকা : শতবর্ষ পরে

শহীদ ইকবাল

পূর্বকোণ থেকে, পুরাণের মতো কে ওই গায়–'তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি'। তুলকালাম করা প্রকৃতির আহ্বান আর ঝটিকা সন্দর্শন না-থাকলে এ পংক্তি রচে কোথায়! 'গহীন গাঙ' কী পরাণের সুখ? মরেও মহুয়া বেঁচে ওঠে, প্রাণসোদরকে নিয়ে পরাণকথা কয়, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে, একনিষ্ঠ করে, একান্ততায় অভিনিবেশে। এই প্রেম এই বঙ্গে–পূর্ববঙ্গে সম্ভব, জীবনবাজি যার প্রাণভোমরা। যৌবনের ডাক আছে যাতে নিরঙ্কুশ সতীত্বে মাখানো। প্রধানত, মাতৃপ্রধান সদন, সেখানে ক্লান্তিহীনতা কইতে নারি, কভু তাতে হেলদোল নেই, পরাকাষ্ঠা শুধু যৌনতায় নয়, সহ্যে-সেবায়। এই তার অহংকার। মৈমনসিংহ 'গীতিকা' পড়া যায় বিভিন্ন ভঙ্গে, রঙ্গেও। যৌবনে রঙ্গ আর জীবনে ভঙ্গ। কীসের ভঙ্গ? সাধুতার। মহুয়া আষ্টেপৃষ্ঠে নদের চাঁদকেই চায়, অস্থিমজ্জায়, রঙ্গরসে, প্রেমে, আসঙ্গের লিপ্সায়, বাসনায়, বিবাহে, পরকীয়ায়, স্বকীয়ায়, অবিবাহে, নিরন্তর রসিক আনন্দে; সেজন্যে গৃহত্যাগ তুচ্ছ, জীবন তুচ্ছ, মাতৃ-পিতৃসমেত সর্বাঙ্গীন সাকুল্য তুচ্ছ। সেজন্যই 'গহীন গাঙ' তার নাগর। সেখানেই সে মরতে রাজি। আরও আছে–সে কার বাণী?–'কোথায় পাব কলসী কন্যা কোথায় পাব দড়ি'–ঠিক উল্টো কী? মনে এলেও ভাবে আসে তুমুল সুরের রাগ। এ সুর পূর্বকৌণিক

মাটির-সূর্যের-গাঙের-নদীর। পথ তার সিক্ত–সঞ্জাত। এ সিক্ততা শরীরের আবেগের, মহুয়ার, মদীনার, কাজলরেখার। ছুঁয়ে দেখা যায় সুরের বাণে। প্রতিপত্তিও তাতেই। কখন এর সৃষ্টি? কেন এ গীতিকা রচিত? প্রেমের লড়াই তো শুধু নয়, কামাতিক্রমী একান্ত প্রেম, নিজস্ব পুরুষে তার নিষ্পত্তি। সুদূরতায় তার আহ্বান। রবীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে। প্রেমকে ঠিক যেভাবে পল্লবিত, মুখরিত করে বিরল হয়, বৈতালিক করে বহুরকমে প্রকাশ করেন, ফুলের কাঁচা রঙে, পরাগের স্নেহে, দোদুল্যমান মৃদুমন্দ বাতাসে তেমনই চারুছন্দের ঢেউ ওঠে। দীনেশচন্দ্র সেন এগুলো পেয়ে যান, জহুরির বাগে। ব্যালাড তো গীত নয়, ছন্দেবর্ণেগন্ধে হার্দিক ও ঋতম মুখরিত। বাতাসে থাকে সুর। ভাটির সুর। হাওড়ের সুর। সম্মিলিত তানে গীতবাদ্য বাজলে মহুয়ার মন ঠিক গন্ধমাদন স্পর্শ নিতেই চায়। পূর্ববঙ্গের ওই ভূগোলে মৈমনসিংহের যে কামরূপের আভা! 'উত্তরে গারো পাহাড়, জয়ন্ত ও খাসিয়ার অসম শৈলশ্রেণী,–তাহাদের পাদলেহন করিয়া একদিকে সোমেশ্বরী ও অপরদিকে কংস ছুটিয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ড ছাড়িয়া দক্ষিণ-পূর্বের নানা ধারায় ধনু, ফুলেশ্বরী, রাজেশ্বরী, ঘোড়া-উৎরা, সুন্ধা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র কৃচিৎ ভৈরব রবে, কৃচিৎ বীণার ন্যায় মধুর নিক্বণে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সকল নদনদীর অন্তর্বর্ত্তী দেশসমূহ এককালে জলের নীচে ছিল। এ সমস্ত প্রদেশটিই এখনও বহু বিল ও জঙ্গলাকীর্ণ। বিলগুলিকে তদঞ্চলে 'হাওড়' বলে।'

তারও আগে ওই ভূখণ্ডকে গুনলে ইতিহাসটা প্রেমেরই। জীবনধর্ম ও জীবনবাদীতার। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্, মানসিংহ কেউই নিজস্বতার বর্জন ঘটাননি। এমনকি তারও আগে ব্রাহ্মণ্যযুগেও না। মৌর্য-গুপ্তও তাল পায়নি। ভূ-ভাগেই গড়া তার বিনা আঘাতের নরম ননীর মতো তনু। প্রকৃতিও তাই ছেয়ে দিয়েছে, ছাওয়া ঘর, বুননির মায়া, তড়পানোর ডাক, বিপরীত মমতার শীতল পাখা–বড়ো হতে হতে ছুঁয়ে গেছে সিক্ত নোনা জলের তরঙ্গ আর বন-বৃক্ষরাজির সুশীতল করুণ অরুণ মন। সুরটা পায় মনে। ধরে তাকে ভেতরের টানে। কিন্তু রণজিৎ গুহ (১৯২৩-২০২৩) 'স্যাবলটার্ন' বললে সেটি কী 'ক্যান স্যাবলটার্ন স্পীক!'–পেরিয়ে আরও একটি পাঠ পেতে চায়। 'নিম্নবর্গের চৈতন্যের অপর যে লক্ষণটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে ধর্মভাব। ধর্মভাব বলতে আমি শুধু ধর্মীয় সংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝাচ্ছি না, বোঝাচ্ছি চেতনার সেই ঐতরিক বা 'এলিয়েনেটেড' অবস্থার কথা যার প্রভাবে জড়জগৎ বা জীবজগতের কোনও সত্তাকে, বাস্তবের বা ভাবনার অন্তর্গত কোনও বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আনতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আর এক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয়, যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।'–এই ভুলই কী প্রেমভাব? তারই আচার কৃষ্টি, অহংকার কী গড়ে দিয়েছে গীতিকার পরত? ঐতিহ্যের যে আধিকারিক তারও বার্তা কী একই! কথার পীঠে কথা আছে ঠিক কান টানলে মাথা আসার মতো। গীতিকার পাঠের নান্দনিকতার সত্য এই শতবর্ষ পর কীভাবে আলোচিত হবে! ভ্রম-বিভ্রমের বাইরে সমাজতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে একে আলোচ্য করতে গিয়ে দ্বান্দ্বিক শর্তে ভাববাদের মোড়কে বস্তুবাদীতার দর্শনকে অন্বেষণ করতে হয়। তাতে 'দৈব' ভুলকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। 'জল ভর জল ভর কইন্যা জলে দিছ ঢেউ'–এর ভেতরে প্রেমের মুকুরই নয় শুধু অবাধ প্রেমের কণ্ঠস্বর আর প্রকৃতির নৈর্ব্যক্তিক আসক্তি দুর্ভর হয়ে ওঠে। সেখানে পূর্ব-বাংলার ব্যক্তি-প্রতীকী রূপ নির্নিমেষ প্রকাশসত্যে অপরূপ হয়ে ওঠে। বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য কী? কীভাবে বাংলা কবিতায় প্রকৃতির রূপ লেগে আছে? কবিমনে এর উচ্ছ্বাসেরইবা দস্তুর কী?

আধুনিক কবিতায় বিদেশিদের বিভাব যখন অঙ্গস্থিত হয় তখন আমাদের ঐতিহ্যে বোধ করি 'মেকানিজমের' কিংবা তুলনার ভারে কোথাও যেন অনভ্যাস লুকিয়ে রয়। কোথাও একটা ফ্যাশনদুরস্ততা প্রবহমান। মৈমনসিংহ গীতিকার যখন শতবর্ষ তখন আমাদের কবিতার চর্চা কেমন! আমাদের প্রচুর কবি পাশ্চাত্যধারায় কবিতা লিখে চলেছেন। প্রচুর কবিও যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু মৈমনসিংহ গীতিকার আস্বাদন কী পিছিয়ে! ঠিক তুলনায় নয়, বোধ-বীক্ষণ-আলোড়ন কম তো থাকে না তাতে! কইন্যা জলে ঢেউ দিচ্ছে, এই ভরা জল কী 'মাহ ভাদরের'–যেখানে মন্দির (গেহ) শূন্য? লোককবির কন্য/কইন্যা সুরে সুর লাগানোর অভীপ্সা–সে জলে ঢেউ দিলে, যৌবনের প্রহরা রচিত হয়। এক ধরনের আততি, জরাতিক্রমী এশ্‌ক–'জল'র প্রতীকায়নে সেটি বহুদূর পর্যাপ্ততা পায়। মানব-মানবী'র রূপকায়ণে সেটি পাঠসূত্রে ব্রাত্য, ধর্মীয় বেড়াজালের বাইরে, জাতপাতের ঊর্ধ্বে, লোকজ আবহে প্রকৃতির সুর ও ছন্দ মানবীয়তার লয়ে অভিষিক্ত হলে সেটি জলের ঢেউ আর মানবমনের লজ্জাব্রত আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকা মৃত্তিকার গন্ধে লালিত। স্বদেশজাত। প্রথার কঠোর বাঁধুনীতে আটকানো প্রগতির রংধনু। সে রংধনু বাহিত সাতরঙা আকাশ আভূমি নত এবং ভক্তিরসে প্লাবিত। একইসঙ্গে করুণায়ও আর্দ্র। সেখানে নিষ্পাপ মন, একাগ্রতা, সতীপরায়ণতার শৃঙ্খলা সন্তপ্তসঞ্জাত হয়ে ধরা দিয়েছে পঙ্‌ক্তিমালায়। আর 'জল'-'মন' একই তালে ভাবাভিব্যক্তি প্রকাশ করলে প্রকৃতি সমূলে বাত্যাতাড়িত হয়ে–মনের আসঞ্জন সিঞ্জনে কাতর হয়। নিশ্চয়ই সেটি পাশ্চাত্যরকমের নয়। হবেইবা কেন? ভূ-ভারতে পূর্ব-বঙ্গের ভৌগোলিক সীমা তো সিক্তমনের আবেগ-আসক্ত প্রেমভাবে দ্যোতিত। এর ভেতরে-বাইরে যে ঘূর্ণি তা ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতোও নয়। একধরনের কর্মনাশা বৈরাগ্য কিন্তু মুক্তি নেই যেন। সেজন্য শতবর্ষ পরে এর পাঠ–'নরোম ননীর মতো'ও হবে না। তাতে ভিন্ন পাঠ জুড়িয়ে, তথ্যকে তত্ত্বে এবং তত্ত্বের প্রায়োগিক পাঠসাম্য রচনা করতে হবে।

সমালোচকদের মত : 'বিষয়বস্তু ও ভাবগত–উভয় দিক থেকে মৈমনসিংহের গীতিকাগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের এক ঐশ্বর্যময় সম্পদ। শিল্পের সকল প্রকরণের সঙ্গে সমাজচৈতন্যেও যে–নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান, লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় ঘটার কারণ নেই। বরং শিল্পের এই প্রাচীন ও ক্রমঅবলুপ্ত শাখাটির সঙ্গে সমাজ-সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে গভীর ও দৃঢ়মূল।' এ-কথাটিকে না-মেনে উপায় নেই। শতবর্ষ পর কেন–পূর্ব-বাংলার এই চিরন্তন ভূমিতে এর যে গভীর প্রেমভাব ও সম্মুখগামী সংগ্রামের অভিপ্রায় সেটি আজও অমলিন রয়েছে–এবং তার প্রপঞ্চগত প্রভাব, বহুধাবিস্তৃত অন্তর্লীনতা–তা এই কর্পোরেট নিও-লিবারেল কালচারেও–ভেতরের সঙ্গতে ভিন্নতর টানের ঐক্য, প্রেম ও সংযমের সমীকৃত বাতায়ন রচনা করে। এখানকার কথাগুলো আমলে নিলে, উত্তরের জল-হাওয়াবেষ্টিত ভূমি কোচবিহার-কামরূপ-মৈমনসিংহ তৎসংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র-বিচলিত অন্দর-সদর জলধারা এ অঞ্চলে 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'মদিনা' কিংবা হুমরা, নদের চাঁদ প্রমুখের লোকজ সংবেদ, পেশা-বৃত্তি-জীবনাচরণের সংগ্রাম কিছুই তো প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ব্যাতিরেকে সৃষ্টি-কাঠামোকে কৃত্য করে না। একান্ততায় ধর্মবোধের সঙ্গে সংশ্লেষ করে প্রণয়ের–সেখানে কী ধর্ম-বর্ণ-প্রথা-পেশা-শ্রেণি কিছুই অবশিষ্ট থাকে? আজকাল প্রযুক্তি আমাদের বাইরের স্বভাবকে ক্রমাগত বদলাচ্ছে, আসলটা হারিয়ে যাচ্ছে, ভেতরের নিকষরূপ বদলের আগেই বাইরের বহরে বহতা যুক্ত হচ্ছে, চাকচিক্য আর কৃত্রিমতার তৈজসে ভেঙে পড়ছে সংযুক্তির পরমার্থবোধ। মৈমনসিংহ গীতিকা ভেতরের, তুমুল রকম নৈসর্গিক, নৃতাত্ত্বিক, ভূগোলকেন্দ্রীক। সেখানেই সমন্বিত প্রহল্লাদ উচ্চাশা নিয়ে থাকে। দ্বন্দ্ব যে নেই তা নয়! গীতিকা তো কাহিনি–সেখানে দ্বন্দ্ব থাকবেই, তবে ততোধিক থাকবে শ্রেণি-বর্ণ-প্রাপ্তি-ক্ষমতার দ্বন্দ্ব–যা চিরন্তন ও মানুষেরই মর্ত্য-সন্ধানী প্রেরণা; আবার বিপরীতে শাসন-অনুশাসনের সংস্কার কিংবা জয়-জয়ন্তীর সামন্ত আবেগ-রাগ আছে–এ নিয়েই গীতিকার বৈভব। এ গীতিকা দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯)র চোখে পড়ে তারল্যে নয়, সহজ করে নয়–গভীরতার দ্বন্দ্বাত্মক আভার অনুসরণে–আর তিনিও ছিলেন জহুর–সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে–বস্তুত সাদামাটা সুরের মোহেই নিজেকে একপ্রকার 'ন্যায়ে' নিবিষ্ট করেছিলেন। ভেতর থেকে দেখলে, মৈমনসিংহ গীতিকা'র চালটি/ ধরনটি কী? এ ভূভাগে যখন ইসলামের ভাবপুঞ্জ প্রভাববিস্তার করে, তখন অনুগত-ব্রাত্যশ্রেণি তাদের কণ্ঠের লালিত্য কিংবা মনের আকুতি কোথায় প্রকাশ করবে, কীভাবে জীবন-জীবিকাকে আশ্রয় করে এ ভাবসুধাকে প্রেরণা হিসেবে নেবে, কীভাবে পারম্পরিক ঐতিহ্যকে নিজের করে নেবে, আর দ্বন্দ্বকেইবা তারা অতিক্রম করবে কোন্ উপায়ে! পাশাপাশি ক্ষমতার ক্ষাত্রশাসন তো রয়েছেই। এই বাঙ্গাল তো পুরোপুরি সাধের বৈরাগ্যে বরণীয়, নদী-প্রকৃতি তাদের রেখেছে বশে, সেভাবেই তাদের জন্ম-জন্মান্তর ভাবনা। মৈমনসিংহ গীতিকা প্রতিনিধিত্ব করে এই বঙ্গীয় অঞ্চলকে। এর আখ্যানরূপ, ইতিহাসের বয়ান, শ্রেণিচরিত্র সবই এই ভূখণ্ডের শুধু নয় বাঙালিত্বের প্রতিরূপ। অসাম্প্রদায়িকতা এর অন্যতম দিক। বর্ণ-জাতিভেদে পার্থক্যেও বদলে আছে নৈকট্য। শ্রেণিভেদ নেই। প্রেমই সব তুচ্ছ করে

দিয়েছে। বিভিন্ন ফোক-মোটিফে আমরা কী দেখি? সেখানে প্রেমের জন্য সাপুড়ে কন্যা আর রাজার পুত্র যে সবকিছু তুচ্ছ করে দিয়েছে, তা নিয়ে 'গহীন বালুচরে' ঘর-করার স্বপ্ন কিংবা রূপকথা-রাজকন্যার কাহিনিতে বা সুয়োরানি-দুয়োরানি, রাখালবন্ধু, মৈষালবন্ধু, বেদের মেয়ে, রূপবান রাজকুমারী ইত্যাকার সব ঐতিহ্য আমাদের জীবনাচরণের গভীরে প্রোথিত। যুগে যুগে এসব হাঁটুরে কবিতা, ভিক্ষুকের গানে, লোকগানে, লোকনাট্যে, মধ্যযুগের নাট্যে, মঙ্গলকাব্যে, চরিতসাহিত্যে–সাহিত্যের বিবিধ শাখা-প্রশাখায় প্রেমের ঐতিহ্যের আধার হিসেবে থেকেছেন এসব নায়ক-নায়িকা। মৈমনসিংহ গীতিকার ভেতরেও এর অন্যরকম প্রস্তুতি ও প্রসার লক্ষ করা যায়। সেটি ক্রুদ্ধ, সংগ্রামী, শ্রেণিচ্যুত, সংরাগে উচ্চকিত, স্নেহচ্ছায়া বঞ্চিত, ত্যাগের মহিমায় রঞ্জিত, ভাবের সংশ্লেষে আবেগাপ্লুত, বেদনার শ্বাসে নিঃস্ব, বিরহের বাঞ্ছায় একাকী, আশার ছলনায় হতো, আকাঙ্ক্ষার অতুল বিভায় রোমাঞ্চিত। মৈমনসিংহ গীতিকা তাই বহুদূরগামী এবং বহুরকমের ছায়ায় রঙিন। কিন্তু কিছুতেই তা শিল্পবর্জিত নয়। লোকমুখের গীতিকা পাছে কারো স্থূলতায় পড়ে সেজন্য অত্যন্ত সতর্ক সৌকর্যে গড়ে উঠেছে এর বন্ধন। বন্ধন তো সহজ রজ্জু নয়। এজন্য যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা-ইমেজ-পার্সোনিফিকেশান দরকার সেটিও অবসিত নয়। ফলে মৈমনসিংহ গীতিকার বিবিধ পালাগুলোতে একপ্রকার নির্মাণ এবং বয়নের কৌশল লক্ষ করা যায়। সে লক্ষ্যে কবিরা শুধু কবিতার ছন্দের দিকেই খেয়াল করেননি, আলংকারিক অভিপ্রায়ের ভেতর দিয়ে পুনর্গঠিত ইমেজের দিকেও স্বতঃশ্চল থেকেছেন এবং রস নিষ্পত্তির ছায়া গড়ে দিয়েছেন। এ কবিরা আধুনিক হয়তো নন কিন্তু স্বশিক্ষায় তারা তুলে নিয়েছেন তাদের চরণবিন্যাস ওই বিভূতিময় প্রকৃতি থেকেই। সে প্রকৃতি তাদের কখনো ফিরিয়ে দেয় না। বরং প্রেরণার অভিমুখে বলে–'উত্তরা বাতাস লাগ্যা পুবালা যে মরে।/ সাত ডিঙ্গা ধর তার পাইল ডিঙ্গাধরে' কিংবা 'কালত পরল বিষয়ে অঙ্গ ছাইল।/ কাল বিষের জ্বালায় সাধু-পুত্র পরাণ ত্যাজিল'। মৈমনসিংহ গীতিকার সর্বত্র আমরা জনজীবনের সঙ্গ-অনুষঙ্গ খুটিনাটি ছান্দসিক কবিদের হাতে পাওয়া যায়। যেটি অপরিচিত নয়। এ বঙ্গের মানুষের প্রাত্যহিক বাদন যেন। কোনো কোনো গীতিকাব্য আখ্যানের বিস্তৃতিতে মহাকাব্যিক পরিসরও পেয়েছে। তাতে ঘনীভূত সংকট পরিণতি পেতে সময় লেগেছে। এক্ষেত্রে কবিয়ালগণ উৎপাদন-সম্পর্ক ও ক্ষমতার বিষয়টি ভেবেই তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করেছেন। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের সংবেদ এখানে প্রগাঢ়। প্রেমের সততা ও ধৈর্য বিস্তর। তবে পরিমিতিও কম নয়। এসব কারণে, এ গুরুত্ব প্রজন্মান্তরে পৌঁছয়–বহুদূর পর্যন্ত। কারণ, এর মধ্যেই নিজের মুখ দেখা যায়। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সরল ও সহজাত। সেটিও জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে তাকে সত্যিকারের জয় দেখানোর কৌশল রয়েছে। 'জল ভর সুন্দরী কইন্যা' বললেই পুরো দৃশ্যপট অবমুক্ত হয়ে পড়ে। এবং সে কন্যা কোন্ দেশে, তার অবস্থা অর্থাৎ শ্রেণি কী, পেশা কী সবই আনুকূল্য পায়।

২

অরবিন্দ পোদ্দারের একটা কথা মনে পড়ছে : 'বাংলায় মধ্যযুগ লৌকিক জীবনের জাগরণ ও অভিব্যক্তিতে চঞ্চল ও মুখর। এই জাগরণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কার সংস্কৃতির কিছুটা স্বীকার করে কিছুটা অস্বীকার করে আত্মপ্রকাশ করে। আর এও স্বীকার্য যে, এই স্বীকার-অস্বীকার একটা মূলগত সংঘাতের ফল; এই সংঘাত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের বিরুদ্ধে লৌকিক আদর্শের সংঘাত, ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের সঙ্গে লৌকিক জীবন-দর্শনের সংঘাত।' এই সংঘাতের ভেতরেই মৈমনসিংহ গীতিকার সমস্ত রচনার মূল সুর নিহিত। কারণ, ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বঙ্গবিজয় যে ফল বয়ে আনে তাতে অনূদিত হয় তাতে পরবর্তীতে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত কল্পে-গল্পে ভাবে-প্রেরণায় বল্লালী বালাইয়ের উত্তরসূরিদের হাতে পড়ে এবং একইসঙ্গে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্যের ভাবানুরাগ এক পর্যায়ে বঙ্গীয় অঞ্চলের মানুষের ভেতরে প্রাণপ্রৈতিচেতনার তথা চিৎপ্রকর্ষ বা রেনেসাঁস সম্পন্নের পথে এগিয়ে যায়। এর কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের ইস্পাতপ্রতীম অনুশাসনের বিরুদ্ধে উদার বৌদ্ধ ও ইসলামের ব্রাত্য সহযোগ–যা পরবর্তীতে লৌকিক ধর্মাশ্রয়ী উদার, মুক্ত, বস্তুবাদিতার, সজীব সক্রিয় জীবনের আধারে পরিণত হয়। মৈমনসিংহ গীতিকার সমস্ত রচনায়ই সেই কাঠিন্যমুক্ত ঔদার্য, সজীব জীবনভাবনার প্রকাশ রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেন : 'এই শ্যামল শস্যশোভনা ধনধান্যময়ী, রাজরাজেশ্বরী বঙ্গ-প্রকৃতি, যাহা দেখিয়া কৃষকের প্রাণ অপূর্ব্ব কবিত্বে মণ্ডিত হইয়া উঠিত এবং যাহা এই মৈমনসিংহ-গীতিকায় উজ্জ্বলভাবে দেখা দিয়াছে।' এই চেতনার সূত্র কোথায়? মধ্যযুগীয় কালপরিধিতে মৈমনসিংহ গীতিকা রচিত, অথচ মধ্যযুগীয় সকল বৈশিষ্ট্য থেকে ব্যতিক্রম–জীবনাশ্রয়ী, ব্যক্তিআশ্রয়ী, রোম্যান্স ও কল্পনানির্ভর কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ। এ সমাজসত্যের প্রামাণ্যস্বরূপ হুমায়ুন কবির বলেন : 'মায়াবাদী, নৈর্ব্যক্তিক ও পরিবর্ত্তনবিমুখ নব্যব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে ইসলামের মায়াবিরোধী, ব্যক্তিকেন্দ্রীক এবং বিপ্লবী সংঘাত যখন লাগল তখন সে সংঘর্ষে ব্যক্তি ও সমাজজীবনের ভিত্তিমূল পর্যন্ত নড়ে উঠল।' মৈমনসিংহ গীতিকায় চার শ্রেণির মানুষ আছে : প্রথম পর্যায়ে নবাব-রাজা-দেওয়ান-জমিদার-কাজি-চাকলাদার, দ্বিতীয় পর্যায়ে বণিক শ্রেণি, তৃতীয় পর্যায়ে সম্পদশালী কৃষক শ্রেণি, চতুর্থ পর্যায়ে নানা পেশার অন্ত্যজ শ্রেণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মানুষ। প্রথম শ্রেণির সঙ্গে সংঘাত শ্রেণি-পেশার তথা জীবজীবিকার সূত্রে শোষণ-পীড়ন, দ্বিতীয় পর্যায়ে নারীর অসম্মান, সম্ভ্রমহানী-ভোগ-লালসা, তৃতীয় পর্যায়ে সম্পদের বণ্টন, চতুর্থ পর্যায়ে অস্তিত্বিক ন্যায়বিচারের প্রশ্ন। এভাবে মোটা দাগে সরলীকরণ করলে মধ্যযুগের শেষদিকে রচিত এ গীতিকার চরিত্রগুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাত তথা প্রচলিত রীতির বাইরে আত্মচিন্তন ও অস্তিত্বকামী মনের প্রকাশ যেমন চক্ষুজ্জ্বল হয়ে ওঠে তেমনি সামাজিক অনুশাসনের রীতি অতিক্রম করে প্রেম-পরাকাষ্ঠায় উচ্চকিত হতে দেখা যায়। সেখানে নারীর কণ্ঠস্বর স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় আভায় ব্যক্তিত্বময়। সে যেমন নারী তেমনি মানুষরূপী জৈব-বাসনারও নিঃসংকোচ উত্তরাধিকার হয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের নেতৃত্বে তাদের সংযম, ব্যক্তিতা, পরাকাষ্ঠা সূক্ষ্ম মনোবেগ ও জীবনধারার চাঞ্চল্যে সজীব ও সুকান্ত হয়ে দৃশ্যমান। গীতিকা তাই তো এত মধুর এবং উচ্চকিত। এই আধুনিক সমাজেরও তা প্রাণের দাবি অস্বীকার করছে না। মহুয়া, মলুয়া, মদীনা এই আধুনিক সমাজেরই নারীর উত্তরাধিকার। শতবর্ষের উত্তরাধিকার এই নারীচেতনাই শুধু নয় অধিকার, সম্পদের বৈষম্য-বণ্টন, ক্ষমতার বিপরীতে ব্রাত্য নিগ্রহণ প্রভৃতি এক সমাজধারার চিরায়ত সংবেদকেই যেন মনে করিয়ে দেয় :

ক) ভাবিয়া চিন্তিয়া মলুয়া না দেখে উপায়।
আপনি থাকিতে নাহি স্বামীর দুঃখ যায়॥
বদনাম কলঙ্ক যত না যাইব সোয়ামীর।
পরাণ ত্যজিবে কন্য মনে কৈল স্থির

খ) বোধনে প্রতিমা আমার ডুবাইলাম জলে।
কি কর এ কর্ম্মফল আছিল কপালে।
আর না ফিরিব ঘরে তোমরা সবে যাও।
শালগ্রাম শিলা যত সায়রে ভাসাও॥

গ) পুবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠিল দেওয়া।
এই সাগরে কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর
ডুইব্যা দেখি কতোদূরে আছে পাতালপুর ॥

উদ্ধৃতিসমূহ গীতিকার প্রতিনিধিত্বশীল চতুষ্টয়-চরণ। যে ভৌগোলিক-সামাজিক প্রতিবেশ এবং ওই স্থানিক নৈসর্গের প্রতিশ্রুত কবি-বাণীর কথা বলেছি, তাই ফুটে উঠেছে গীতিকার ছত্রে ছত্রে। যে কোনো ভাবের পশ্চাৎপট ও পরিপ্রেক্ষিত থাকে, সেমতেই ভাবের প্রকাশ অবমুক্ত হয়। ক-অংশে মলুয়া'র যে ভাবনা, সেটি সামাজিক পরিস্থিতি, সংস্কার ও একধরনের আশঙ্কার সাহসে আক্রান্ত। 'ব্যক্তি'ধর্মিতারও উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশ। যে-কালে যে-সময়ে এগুলো লোকমুখে চলছে–সেখানে 'পরাণ ত্যজিবে কন্যা মনে কৈল স্থির'–এ স্থিরতার নারী-সংকল্প একপ্রকার পরিপ্রেক্ষিত থেকে রচিত। সেখানে দ্বন্দ্ব-অভিঘাত এবং নারীর সতীত্ব, ব্যক্তিগত অভিরুচির অভিপ্রায় বিরাজমান। ভাষাটিও অঞ্চলের ব্রাত্যপ্রতীম, প্রান্তিক। সমাজচিত্রটিতে পরাণের চেয়ে তার সম্ভ্রম গুরুত্বপূর্ণ, একালের সেটি বিলুপ্ত না হলেও সম্ভ্রম তো এখন শৈথিল্যে নিপতিত একইসঙ্গে সংযম ও শারীরিক সংসর্গ কোনো অনুশাসনের আওতায় নেই। এর পেছনে বাণিজ্যিক প্রশ্রয়, বিলাসিত, ভোগগ্রস্ত সমাজের বিকার স্পষ্ট। সেটি অন্য আলোচনা। কিন্তু এই বশবর্তী

নারীর সৌন্দর্য সাংসারিক পরিবৃত্ত-উদ্দিষ্ট এবং সেখানেই সে পতিব্রাত্য-সমর্পিত জীবনের নিঃশেষটুকু অবলোকন করে। এইটিই তার বাঁচার দর্শন। ঠিক কাছাকাছি খ-অংশে 'বোধনে প্রতিমা' চিত্রকল্পের প্রায় একই আত্মত্যাগ অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে। নারীর সর্বংসহা কৃত্য জীনগত (genetic)। অন্তত বাঙালি রমণীর। সেটি শায়রে [সাগরে] ভাসলেও তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তবে এখানে বিষয়বস্তু একই হলেও ধর্মীয় অনুশাসনের দ্রোহ নেই কিন্তু প্রকাশ-প্রবণতার প্রাবল্যটি সরল এবং স্বচ্ছন্দশীল। নিখুঁত ছন্দ, অলংকারের বাঁধন ঋজু, পঠনে নেই অতৃপ্তি, ভাষণে কূটকচালের বদলে নির্ভার অকপট নির্ভেজাল আদিষ্ট প্রয়াস। মৈমনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্যই তাই। দীর্ঘ সময়ের ভেতরে ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসনের বিবর্তন ধারা, তারপর ইসলামের আগমন, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে আমরা দেখেছি রোম্যান্টিক তথা রোমান্সধর্মী সাহিত্যে দেবতার 'ডগমাটিজম' প্রশ্নের মুখে পড়েছে। শরীরী-সংবেদ তার জায়গা দখল করেছে। এখন আমরা দেখি সমস্ত অনুশাসন ভেঙে নিঃশেষ। বরং বিপরীতে ধর্মীয় রীতির বিকার শুরু হয়েছে। পুঁজির প্রসারে ভেঙে পড়েছে মূল্যবোধের অভিমান। সেটি বাণিজ্যিক রাজনীতির অংশ হয়ে গেছে। সেখানে এক একটি বিকার গ্রাস করে ফেলছে। বাস্তবতাই বীভৎস পরিবেশ তৈরি করছে। সামন্ত সমাজের বৈভব এখন কর্পোরেট সমাজে আলাদা মাত্রায় ফিরে এসেছে, ফলে–আগ্রাসনের নতুন রূপই নিও-লিবারেল সমাজ, গ্লোবালাইজেশানের নামে যেখানে কোনো অঞ্চল সীমিত নেই, ভাষা সীমিত নেই, ব্যক্তি আঞ্চলিক আবদ্ধতা থেকে মুক্ত। এখানে পণ্য সবকিছু। পণ্য আর ভোগ–যার কেন্দ্র পুঁজি। ফলে মৈমনসিংহ গীতিকায় যা পাওয়া যায় সেটি একটি পর্যায় পর্যন্ত আমাদের আত্মদ্বন্দ্ব আর ব্যক্তি অবমোচনের সময়। ক্যাননশিপ ভাঙ্গার সময়। এখন তো দ্রুত সময় বদলাচ্ছে। কোনো অঞ্চলে কিছু সীমাবদ্ধ থাকছে না। ফলে, ক্যাননশিপ নানা রঙে নানা পটে সকলকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাতে 'ইমেজ' রিপ্রোডাকশন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রদান করছে। 'ইমেজ' তো নকল, ব্যাপক অর্থে তা বিকার; মূল্যবোধ ও মনুষ্যত্বের বিপরীতে মিথ্যা আলোর ঝলকানি। কিন্তু মিথ্যাই সত্য হয়ে সমুখে দাঁড়িয়েছে। ফলে 'শালগ্রাম-শিলার' সংস্কার কে মানবে? হ্যাঁ, তবুও এর প্রয়োগ আছে, তাতে স্ববিরোধিতা আর দোলাচলের বিকার শক্তি নিয়ে স্থির। শালগ্রাম শিলার মাহাত্ম্য আত্মায় সংস্কার হয়ে থাকে কিন্তু পরক্ষণই তা বাতিল হয়ে অন্য দিকে ধাবিত হচ্ছে। প্রতারণা বা প্রবঞ্চকের ছায়ায় ডুবে যায় ক্যাননশিপ। ফলে মৈমনসিংহ গীতিকা আমাদের ঐতিহ্য, সময়ের একটি স্টেপ, পরিবর্তনের ও নান্দনিকতার চিরায়ত অভিমুখ কিন্তু বর্তমানে তা বাস্তব পরিস্থিতির কারণে মনুষ্যত্বের অভিমানে বিরূপ। এ বিরূপতা আপাত মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার দম্ভ কিন্তু দূরে ঠেলে দেওয়ার পথ নেই। উদ্ধৃতির গ-অংশের যে সাহসী অভিপ্রায় সেটি দ্রোহ আর বিদ্রোহের নিবিষ্ট নিঃশঙ্ক হাত। নদী-সাগর-নাও এগুলো ওই সময়ের জীবন-জীবিকা ও জীবনধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত। উৎপাদন সম্পর্কই মানুষের মন ও মনস্তত্ত্ব রচনা করে। সেখানেই জীবনের অভিমুখসমূহ রচিত হয়। পূর্ববঙ্গ নদনদী-জালজেলে, নাতিষিতোষ্ণ হাওয়া, বারোমাস্যা, প্রকৃতির ছায়াঘন রূপ, নৈসর্গিক আবহ নিয়ে পুনর্গঠিত। এতেই তার ধর্ম ও জীবনের সুধা পরিকীর্ণ। এই ঔদার্যই হয়তো তাদের উদার, অসাম্প্রদায়িক করেছে। রীতি-অনুশাসনের বিরুদ্ধাচারণ করতে সাহস যুগিয়েছে। সেগুলো ভেঙেই গোপন প্রেমের পরাকাষ্ঠার শপথ কিংবা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে গাঙের ঢেউয়ের সঙ্গে প্রেয়সী বা প্রিয়তমার জন্য করেছে শপথ। অধ্যাত্ম-দর্শনটিও তাতেই ধ্যেয় হয়ে উঠেছে। কবিতায়-গানে-গীতিকায় তারই রেশ পরিশ্রুত। বিশেষ করে, গীতিকাগুলোর আঙ্গিক তো আলাদা। গীতিকবির গীতই শুধু মুখ্য নয়, নৃত্য-রঙ্গরস-রসিকতা, জীবনের তুলনীয় রূপ সবই তাতে ব্যাখ্যেয়। বস্তুত, জীবনধর্মী সতেজ ও স্বাবলম্বী জীবনের রূপই এর প্রধান প্রকাশ। গীতিকা বা ব্যালাডে কৃষ্টির প্রশ্রয় তীব্র। ব্যক্তিধর্মিতা এর মৌল দিক। সে কোনো শাসন-ত্রাশন মানে না। স্বয়ম্ভূ হয়ে নিজের কথা সে নির্বাধ বলে চলে। সেজন্য অকপটে সে অসাধ্যকে সাধ্য করতে চায়। এবং সেভাবেই সুর তৈরি করে। 'পুবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া উঠিল দেওয়া।/ এই সাগরে কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥/ ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কত দূর/ ডুইব্যা দেখি কতোদূরে আছে পাতালপুর ॥'–এই যে অকুতোভয় আবেগ সেটি মৈমনসিংহ গীতিকাতেই সম্ভব। পাতালপুরের অনুসন্ধান নিষেধের তর্জনীকে অস্বীকার করেই নির্মিত। আবার নিষেধের ভেতরেই আগ্রহের মুকুর লুকিয়ে থাকে। তাই তো জীবনের যে পরত তা পলে পলে প্রেমে, সংগ্রামে, জীবনে-জীবিকায় প্রকাশিত হয়। আর এর সাহিত্যের বিভা ছন্দের সৌখিনতা, অলংকারের দৃঢ়তা তৈরি হয় প্রকৃতি-লগ্নতার কারণেই।

৩

দীনেশচন্দ্র সেন মেধা ও অভিজ্ঞতার সম্মিলনে মৈমনসিংহ গীতিকা পাঠকের হাতে পৌঁছুতে পেরেছেন। এর সংকলন ও সম্পাদনার সহজ কাজটিকে তিনি কোনোকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অস্বীকার করেই করেছেন। শতবর্ষ আগে তা সহজ ছিল না। লোকজীবন, লোকসংস্কৃতি, লোকহিত, লোকভাষা–তাবৎ 'লোক' চিন্তার অর্থাৎ সামষ্টিক জনগোষ্ঠীর প্রীতিময় অহংকারকে গ্রহণ করে তিনি আমাদের জাতিসত্তার একটি অনালোকিত অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার এবং পরিচিতি করার ব্যবস্থা করেন। নিশ্চয়ই এর ভাষা দৌলত কাজীর নয় বা আলাওলের নয়। এর যে লালিত্য, সুরের যে মূর্চ্ছনা–বৃহত্তর পর্যায়ে তার যে গ্রহণীয়তা সেটি সমসময়ের তো বটেই একালেও অসম্ভব। কারণ, ভাষা বদলায়, বিবর্তনের পথ ধরে সম্মুখে এগোয়। সেই বাঁক বদলের পথে যে জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ভাষার পরিচয় ঘটে, তাদের জীবনযুদ্ধের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রাপ্তি ঘটে, গ্রহণ-বর্জনের কৃষ্টি গড়ে ওঠে, সংস্কৃতির বাঁক বদলের পর্যায় রচিত হয়, কঠোরতার বেড়াজাল অতিক্রম করে উন্মুক্ত অবারিত আস্বাদময় আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটে সেটি নিশ্চয়ই একটি সময়ের নির্ঘণ্ট। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে অপরিসীম পরিশ্রমে এটি আগলে রাখলেন! এসব তথ্যের দায় আমাদের নিতে হবে নিজস্বতার স্বার্থে, আত্মপরিচয়ের স্বার্থে। তবে সেইটিই শেষ কথা নয়। মৈমনসিংহ গীতিকার এখন কী প্রয়োজন? কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক পাঠই মুখ্য নয়। এর বিষয়, বিষয়-উৎপন্নের প্রেক্ষাপট, ভাষা, অলংকার, ইমেজ, প্রকাশভঙ্গি–প্রভৃতির ঐতিহাসিক সম্বন্ধ কী? কেন এটি আলাদা, কেন এর প্রকাশভঙ্গির স্বরূপ সমসময়ের অন্য ভাষা থেকে আলাদা–এর উত্তর পেতে চাই। শতবর্ষ পরে মৈমনসিংহ গীতিকার ঔজ্জ্বল্য, চরিত্রায়ন, জীবনদর্শন, শাসক-শোষক দ্বন্দ্ব, নারীত্ব, পুরুষতন্ত্র, ভোগ-লালসা-সম্ভ্রম প্রত্যেকটি ভাবনার উদ্রেকের পেছনের কারণ অনুসন্ধান জরুরি–বিশেষ এই কর্পোরেট পুঁজির আগ্রাসী সময়ের দাপটের বিপরীতে দাঁড়িয়ে–যেখানে মানবতা, মানবিকতা হচ্ছে পণ্যের কারবারি; মানুষের জীবন হচ্ছে বিপন্ন, বৈষম্য ও বণ্টন ব্যবস্থা ক্রমাগত মানুষে মানুষে ব্যবধান বাড়াচ্ছে। মানুষ আলাদা হয়ে যাচ্ছে। একাকিত্বে আর স্বার্থপরতায় নিঃশেষে নিজেদের ডুবিয়ে দিচ্ছে। এখান থেকে মুক্তির উপায় কী? মৈমনসিংহ গীতিকা আমাদের কী শেখাচ্ছে? পঠনেই-বা কাজ কী? কী তার ভেতরের পাঠ। ওর ভাষার ভেতরের মাধুর্য কী নিছকই সৌন্দর্যমাত্র? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে। মৈমনসিংহ গীতিকা ব্যক্তির বিপরীতে সামষ্টিক জীবনবাদিতার অনুসন্ধান করে, নারীর আত্মত্যাগ ও সম্ভ্রমের দায়ের ভেতর সে পণ্য শুধু নয় জীবনকেও চ্যালেঞ্জ করেছে, শোষকের বিরুদ্ধে সামষ্টিক লড়াইয়ের মধ্যে অধিকার ও বঞ্চনার কথা বলেছে, বণিক বৃত্তির শক্তির লোভ ও লালসার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রান্তিক মানুষের স্বার্থকে বিবেচ্য করেছে–যেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষের জয়ই বিঘোষিত হয়েছে। স্মর্তব্য, এসব প্রতীকী বিরোধ বা দ্বন্দ্বের চিত্র কিন্তু মধ্যযুগের বলয়ের ভেতরেই। কিন্তু আমরা তো আধুনিক যুগে তথ্যপ্রবাহে প্রবেশ করেছি। ইমেজের মধ্যে নিজেদের ব্যস্ত রাখছি। কিন্তু বাস্তব অর্থে আমরা কতোটা আধুনিক হয়েছি? প্রতিরোধের যুদ্ধে, প্রান্তিক মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে, বিভিন্ন সংস্কার-কুসংস্কারের রীতি বাতিলের যুদ্ধে আমরা কতোটা সফল? ক্যাননশিপ তথা ডগমাটিজম আমাদের সমাজে জেঁকে বসেছে–সেখান থেকে মুক্তির যুদ্ধ কোথায়? আমরা তো সবকিছুই ভুলে শুধু ইমেজের রাজত্বে 'শিল্পের জন্য শিল্প'–ধরনের ফেটিশ ওয়ার্ল্ডের অংশীদার হয়ে বসে আছি! যেখানে মানবতা সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধের মুখে।

শতবর্ষ পরে মৈমনসিংহ গীতিকা পাঠ এরূপ বিরূপ তথাকথিত আধুনিকতার মুখে ছাই দিয়ে নিশ্চয়ই মানবতার পক্ষে নতুন বিশ্ব গড়ার সাহস রাখে। যেখানে মানবতার পক্ষ রচিত হবে এবং সমস্ত বিপন্ন মানুষের পক্ষ হয়ে তার আখ্যানগুলো শুধু জীবনেরই গান গেয়ে শোনাবে। •

শহীদ ইকবাল
লেখক, অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধের
ছোটগল্প

মাটির টান

পলি শাহীনা

‘সবক’টা জানালা খুলে দাও না
আমি গাইব, গাইব বিজয়েরই গান।
ওরা আসবে চুপিচুপি,
যারা এই দেশটাকে ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।’

রান্নাঘরে মা গুনগুন করে গাইছেন। এটা মায়ের খুব পছন্দের গান। তাঁর গানের কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা না গেলেও সুরের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। বাবার হাতে ধূমায়িত চায়ের কাপ, চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যান। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে বাবা এগিয়ে যান রান্নাঘরের দিকে। মা তখনো খালি গলায় আপনমনে গেয়ে চলছেন–‘চোখ থেকে মুছে ফেলো অশ্রুটুকু, এমন খুশির দিনে কাঁদতে নেই।’ এবার বাবাও মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুর করে গাইতে থাকেন। ঘরের ওপর ছাতার মতো ছায়া দেওয়া বাগানবিলাস গাছের ফাঁকফোকর গলে বারান্দায় সূর্যের আলো এসে পড়েছে। সেখানটায় চাদর মুড়ি দিয়ে খেজুরগুড়ের সঙ্গে গরম রুটি খেতে খেতে দাদা রোদ পোহান। দাদার চাদরের উষ্ণতায় বসে তন্ময় হয়ে আমি বাবা-মা’র গান শুনছি

মুখের ওপর টুপটাপ পানির ফোঁটার স্পর্শে জেগে উঠি। চোখ মেলে দেখি, আমার মুখের ওপর মায়ের কান্নাভেজা মুখ। ‘একটু ওঠ মা, যেতে হবে।’ এত রাতে কোথায় যাব, বলে লাফ দিয়ে আমি শোয়া থেকে উঠে বসি

ভোরের বাতাসে একটা মিঠে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। দেখি, ডানদিকের জানালার শার্সিতে নিরিবিলি বসে আছে একটা নীলপাখি। দাদা বললেন, নীল বিষের চিহ্ন! নীলপাখি তার নীল ঠোঁটে নীল পান করে নেয়! মনোযোগ দিয়ে দাদার কথা শুনছিলাম আর নীল পাখিটি দেখছিলাম, ঠিক এই সময় লোহার গেটের তীব্র ঠকঠক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

ঘুম ভেঙে বাইরের গমগম আওয়াজে বুঝতে পারি, ওরা চলে এসেছে। এরমধ্যে মা এসেও তাড়া দিয়ে গেছেন, দ্রুত উঠে ফ্রেশ হয়ে যেন ঘরের বাইরে আসি। শীতের দিনে কম্বলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে যে কিছুটা সময় লাগে, কীভাবে যে মাকে সেটা বোঝাই! উঠব উঠব করেও আরো বেশ কিছুটা সময় কম্বলের সঙ্গে আলসেমি উদ্‌যাপন করি। এই সময় ছোটবেলার দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে। টিনশেড চৌচালা ঘরের বারান্দায় রোজ সকাল-সন্ধ্যায় কবিতা-গান-পুথির আসর বসত। দাদা পুথি পাঠ করতেন। বাবা-মা কখনো গাইতেন, কখনো-বা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দের কবিতা পড়তেন। সোহান ভাই আর ছোট্ট আমি চুপচাপ মুগ্ধ হয়ে তাঁদের মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম, শুনতাম। সোহান ভাই মাঝেমধ্যে দাদার সঙ্গে পুথি পাঠে অংশ নিতো। আড্ডা শেষে দেখতাম, দাদা নিঃসীম শূন্যতায় উদ্দেশ্যহীন অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, আর বাবা উঠোনে নেমে এদিক-ওদিক দ্রুত পায়চারি করতেন। শীতের দিনেও তাঁর মুখে তখন বিন্দুবিন্দু ঘাম চিকচিক করতে দেখেছি। মা ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। অথচ, এর মাঝখানে স্রোতের মতো অনেক সময় গড়িয়ে গেছে। বাবার মৃত্যু, সোহান ভাইয়ের বিদেশে চলে যাওয়া, আমার বিয়ে, সবমিলিয়ে এই বাড়ির চিরাচরিত রূপ বদলে গেছে সেই কবে। এত বছর পরও ছবির মতো অতীত ঘটনাগুলো চোখের মণিতে এসে ভিড় করে। ভীষণ ইচ্ছে করছে ফেলে আসা দৃশ্যের কাছে ফিরে যেতে, ফেরা হয় না। জীবন একমুখি, বিকেলের বাঁকে কখনো সকালের রোদ খেলে না। সময়ের নদীতে কেবলই ভাটার টান!

মায়ের হাঁক পাকে স্মৃতির পাতা ওল্টানো বন্ধ করে দ্রুত কক্ষ থেকে ঘরের বাইরে এসে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। ইতিহাসে আমি ভালো হলেও অংকে বরাবর কাঁচা। অংক বোঝাতে গিয়ে আমাদের গৃহশিক্ষক সবসময় বলতেন, আমার মাথায় গোবর ছাড়া নাকি আর অন্য কিছু নেই। শিক্ষকের কথা শুনে নানু হাসতে হাসতে আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলতেন, মাথায় গোবর বলেই তো চুল এত ঘন, আর বড়। আমাদের দেশে অংক জানা হলো মেধার সর্বোচ্চ ধাপ। বঙ্গদেশে জন্ম নেয়া মেধাহীন আমি ঘরের বাইরে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো মানুষ গুনতে গুনতে হাঁপিয়ে উঠি। গতকাল মায়ের তৈরি করা একশো ব্যাগ চাল-ডাল, এবং একশো কম্বল শতাধিক মানুষের মধ্যে কীভাবে ভাগ করবেন, ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ততক্ষণে হিমাঙ্কের নিচে।

বোধ-জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখে এসেছি, প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বাবা তাঁর সামর্থ্যের মধ্যে শীতবস্ত্র দেন। শুনেছি, এই কাজটা দাদা শুরু করেছিলেন। দাদা গত হওয়ার পর বাবা এই ধারা অক্ষুণ্ন রাখেন, এখন মা করেন। এই বাড়ির শরীরে লেগে থাকা অনেক সংস্কার সময়ের আবর্তে মুছে গেলেও ১৬ ডিসেম্বর শীতবস্ত্র দেওয়ার রীতিটি জীর্ণ শরীরে মা এখনো ধরে রেখেছেন। মায়ের অনুপস্থিতিতে সোহান ভাই, কিংবা আমি এই ধারাটি ধরে রাখব কী না, জানি না। মা আমাদের জীবনে কখনো থাকবেন না, প্রকৃতির এই অমোঘ চক্রটি ভেবে বুক ধক করে ওঠে। মায়ের শরীরটা অনেক ভেঙে পড়েছে। বাবা চলে যাওয়ার পর গানের পরিবর্তে মাকে দেখি যখন তখন কারণে-অকারণে কান্না করেন। নিষ্পত্র গাছের মতো কেমন ধূসর হয়ে পড়েছেন। একদম হাসেন না, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকেন। ‘চল শুভ্রা কাজ শুরু করি ’ ঘাড়ের কাছে মায়ের ডাক পেয়ে ভাবনা থেকে বেরিয়ে বাস্তবে ফিরে আসি। মা, এই তো দেখছি মানুষের সমুদ্র, একশোটা ব্যাগ কেমন করে দেবে এত মানুষের মধ্যে? আমার মাথা তো লাটিমের মতো ঘুরছে। আমার কথা শুনে মা দীর্ঘশ্বাস টেনে বলেন, ‘ওরা কেউ সাধ করে আসেনি। অসহায় মানুষগুলো শীতের কষ্টে দূরদূরান্ত থেকে এসেছে। তাঁদের অনেককেই আমি বলিনি, চিনিও না। এত মানুষ দেখে আমিও চিন্তিত, কিন্তু কিছু করার নেই। সোহান থাকলে ভালো হতো আজ।’

মা-মেয়ে নিঃশব্দে কিছু সময় মুখ চাওয়া-চাওয়ি শেষে গেট খুলে যা ছিল আমাদের ভান্ডারে তা নিয়ে তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াই। লক্ষ করি, চাদরে মোড়া মা শীতের মধ্যে ঘামছেন। সবকটা ব্যাগ শেষ হয়ে গেলে মা নগদ টাকাসহ ঘরের কিছু সরঞ্জামাদি দিয়ে সেদিনের মতো ব্যাকুল চোখের মানুষদের বিদায় জানান।

শীতের বিকেল তখন পাতলা আঁধারের কাছে সমর্পণের পথে। মায়ের মুখটা বড় ক্লান্ত দেখায়। প্রতি বছর এই দিনে শীতবস্ত্র দেয়ার আগে মায়ের চোখেমুখে যতটা আনন্দ থাকে, দেয়ার পর কয়েকদিন তিনি কেমন নিষ্প্রাণ, অন্যরকম হয়ে থাকেন। কেন এমনটা হয়, জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাইনি। মা কখনো বিষণ্ন, কখনো প্রাণবন্ত, কখনোবা অভিমানি। মাঝেমধ্যে মনে হয়, সন্তান হয়েও মায়ের মনের মানচিত্র আজো ভালোভাবে জানি না। ধীরে ধীরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এলে মাকে বিশ্রাম নিতে বলে নিজের কক্ষে ফিরে যাই। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতে কখন যে ঘুমের দেশে কাদা হয়ে যাই, টের পাই না।

মুখের ওপর টুপটাপ পানির ফোঁটার স্পর্শে জেগে উঠি। চোখ মেলে দেখি, আমার মুখের ওপর মায়ের কান্নাভেজা মুখ। ‘একটু ওঠ মা, যেতে হবে।’ এত রাতে কোথায় যাব, বলে লাফ দিয়ে আমি শোয়া থেকে উঠে বসি। মা বিছানার এক কোণে বিষণ্ন হয়ে বসে আছেন। তাঁর চোখেমুখে তীব্র কষ্টের ছায়া। কিছুই বলছেন না, শুধু চোখ বেয়ে বৃষ্টির মতো অশ্রু ঝরছে। এমন এক অবস্থায় মা বসে আছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে মানুষ মনে হয় না, মনে হয় পাথর। রানির মতো আমার ঐশ্বর্যময়ী মাকে এমন করুণভাবে কাঁদতে দেখে আমার ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কী বলে সান্ত্বনা দেবো, সেই ভাষা খুঁজে না পেয়ে সোজা বললাম, চলো মা।

মায়ের হাতে টর্চলাইট আর কম্বলের ব্যাগ, আমার হাতে আরেকটা ব্যাগ, আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। দিনের বেলায় মা কখন চাল-ডাল, আর কম্বলের একটা ব্যাগ সরিয়ে রেখেছিলেন, খেয়াল করিনি। শুভ্র কাফনের কাপড়ের মতো কুয়াশা ঢেকে রেখেছে সমস্ত চরাচর। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমরা ছাড়া পথে আর কোনো জনমানব নেই। থেমে থেমে দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছিল কানে। পড়াশোনার জন্য অনেক বছর আগে এই গ্রাম, বাড়ি ছেড়েছিলাম, আর ফেরা হয়নি। মাঝেমধ্যে অতিথির মতো এসেছি, চলে গিয়েছি। ভাবছি, ব্যক্তিগত আর পেশাগত জীবনের ব্যস্ততায় ডুবে অনেক বছর ধরে শুধু বাড়ি নয়, মা থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। কাজের জায়গায় আমি সফল হলেও সম্পর্কের জায়গায় অসফলতা এই গভীর রাতে আমাকে কুঁড়েকুঁড়ে খাচ্ছে। ব্যস্ততা আমাকে মায়ের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছে ভেবে বুকের গহিনে একটা অপরাধ বোধ কাজ করছে।

মাকে অনুসরণ করে হাঁটতে হাঁটতে আমরা বেশ কিছু দূরে একটা

বড় বেড়িবাঁধের পূর্বপাশের বাঁশঝাড়ের কোণে একটা ঝুপড়ি ঘরের সামনে এসে থামি। এমন রাতবিরেতে একটা ভয় ঘিরে ধরে আমাকে। মা কোথায় এলেন, কিছু না বুঝে আমার মাথাটা চরকির মতো ঘুরতে থাকে। মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে 'কালুর মা' বলে বারকয়েক ডাকার পর ভেতর থেকে দরজা খুলে যায়। লাঠিতে ভর দিয়ে ছেঁড়াফাঁড়া শাড়িতে বেরিয়ে আসা কালুর মায়ের দিকে তাকিয়ে *পথের পাঁচালী* সিনেমার ইন্দির ঠাকুরণের মুখটা ভেসে ওঠে আমার চোখে। কুঁজো হয়ে হাঁটা, চুল, মুখের আদল, দৃষ্টি, সব মিলিয়ে অনেক মিল, আপনমনে আওড়াতে থাকি। আমার মা আর কালুর মা, তাঁরা একে অপরকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ অনড় হয়ে ছিলেন। অন্ধকারেও আমি তাঁদের মুখের উজ্জ্বলতা দেখতে পাই। বাঁশঝাড়ে রাতজাগা পাখিরা তখন নিঃস্তব্ধতা ভেঙে তুমুল বেগে শিস দিয়ে যাচ্ছে। কালুর মা মাদুর বিছিয়ে আমাদেরকে বসতে দেন, মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে আদর করেন। কুপির আলোয় কিছু সময় তাঁরা গল্প করেন। গল্পের পাট চুকে গেলে কালুর মা'র থেকে বিদায় নিয়ে টর্চের আলোয় ভরসা করে আমরা অন্ধকার সাঁতরে বাড়ির পথে হাঁটতে থাকি।

বাড়ি পৌঁছে মায়ের মুখে একটা প্রশান্তির প্রলেপ দেখতে পাই। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, তিনি যেন সদ্য সশরীরে স্বর্গ আরোহন শেষে মর্ত্যে ফিরে এসেছেন। তাঁর মন প্রফুল্ল দেখে পাশে শুয়ে চুলে বিলি কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করি,

: কে এই কালুর মা?

: তিনি একজন বীরাঙ্গনা।

মায়ের উত্তর শুনে বিহ্বল হয়ে পড়ি। লক্ষ করি, মায়ের হাত মুষ্টিবদ্ধ, খানিক আগের তাঁর উজ্জ্বল মুখখানা জখমি চাঁদের আলোর মতো ম্লান হয়ে যায়। কালুর মায়ের জন্য আমার মনে মেঘ জমে, চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। নিজেকে সামলে পুনরায় জানতে চাই,

: তাঁর বয়স কত, মা? স্বামী, সন্তান কই?

: তাঁর বয়সের হিসাব আমার জানা নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিলিটারি তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে।

: কালু কই?

: কালুর ভালো নাম, কালাচাঁদ। বাপের রংটা পেয়েছে ছেলে। মা আদর করে কালু বলে ডাকতো। ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার জের ধরে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া সহিংসতা এই গ্রামেও ছড়িয়ে পড়লে কালু তখন ভারতে ওর আত্মীয়-স্বজনের কাছে চলে যায়।

: কালুর মা যায়নি কেন?

: মাটির টানে যায়নি। যে মাটির বুকে তাঁর স্বামী চিরঘুমে ঘুমিয়ে আছেন, সে মাটিতে তিনিও ঘুমাতে চান, এবং এটাই তাঁর অন্তিম ইচ্ছে। কালু মাকে সঙ্গে নেয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, তিনি যেতে রাজি হননি।

: বয়স হয়েছে, তাঁর সংসার চলে কীভাবে?

: আগে তোর বাবা সাহায্য করত। কালুর মা-ও গান শিখিয়ে কিছু অর্থ পেত। আমি তাঁর কাছেই গান শিখেছিলাম। বহু আগের কথা হলেও তখন ভালো দিন ছিল। মানুষ সংস্কৃতিমান ছিল। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই ছিল। এখন দেশটা, সময়টা অন্যরকম হয়ে গেছে। হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন, কালুর মা যেন গ্রামের বাচ্চাদের গান না শেখান। অবশ্য, বয়সের ভারে শারীরিক, মানসিকভাবে তিনিও ভেঙে পড়েছেন।

: এখন তাহলে কীভাবে চলে তাঁর?

: সোহান আর তোর সাহায্যে।

: বুঝলাম না!

: বিভিন্ন উৎসবে তোরা আমাকে যা টাকা পয়সা দিস, আর যা তোদের থেকে চেয়ে নিই, সেখান থেকে তাঁকে সাহায্য করি।

: তাঁর প্রতি তোমার ভালোবাসা দেখে অবাক হচ্ছি, মা!

: কালুর মায়ের রক্ত পান করেছি, তাই তাকে এত ভালোবাসি। মৃত্যু অবধি তাঁর প্রতি আমার ঋণ পরিশোধ হবে না।

: কী বলছ এসব?

: হ্যাঁ, আমি আর কালুর মা একই ক্যাম্পে বন্দি ছিলাম। রাতভর মিলিটারি আর রাজাকারের অত্যাচারে প্রায় বেহুঁশ আমি, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে, মনে হচ্ছিল মারা যাচ্ছি, তখন পাশে পড়ে কাতরাতে থাকা কালুর মায়ের ঠোঁটফাটা রক্ত জিভ দিয়ে টেনে পান করে গলা ভিজিয়েছি। কালুর মায়ের রক্ত পান করে সেদিন আমার জীবন বেঁচেছিল। আমার এই নরক যন্ত্রণা বাসের কথা জানে শুধু তোর মুক্তিযোদ্ধা বাবা, আর তোর নানা-নানি।

: যে শরীরে আমার জন্ম, এতদিন কেন সেই শরীরের নিদারুণ কষ্টগুলোর কথা ভাগ করে নাওনি, কেন জানাওনি, মা?

: তোর বাবার বারণ ছিল। আর কদিন বাঁচব, জানি না। সোহান বিদেশে চলে যাওয়ায় স্বস্তি পেয়েছি। তুই দেশে আছিস, আজ আমার মনে হলো তোর জানা দরকার, তুই একজন বীরাঙ্গনার সন্তান।

ফজরের আজান শুনে মা উঠে যান নামাজ পড়ার জন্য। ঘরের ভেতর আমার দম নিতে কষ্ট হচ্ছে দেখে বেরিয়ে পড়ি খোলা আকাশের নিচে, উঠোনে। দাদার মতো শূন্যে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলে বুকের চাপ কিছুটা কমে আসে। জানালার শার্সিতে ছোটবেলায় দেখা নীলপাখিটি খুঁজতে থাকি। আমার ইচ্ছে করে, নীলপাখি হয়ে মায়ের সমস্ত কষ্ট পান করে নিতে। আকাশ তখনো ফর্সা হয়নি। 'সবকটা জানালা খুলে দাও না ' অনেকদিন বাদে মা আজ গাইছেন। ধীরে ধীরে পুবাকাশে সূর্য ওঠে। প্রথম ভোরের কাঁচা আলোয় উবু হয়ে নারকেল পাতার শলা দিয়ে আমি মাটির বুকে বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকি। মা আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে সেই মানচিত্রের ওপর চন্দ্রমল্লিকার পাপড়ি ছিটিয়ে দেন। •

পলি শাহীনা
কথাসাহিত্যিক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ
ভারত বিচিত্রা
লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। –সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....
Address :..... Bank Account Name :.....
..... Account No :.....
..... Bank Name :.....
Phone/Mobile :..... Branch Name :.....
e-mail :..... Routing No :.....

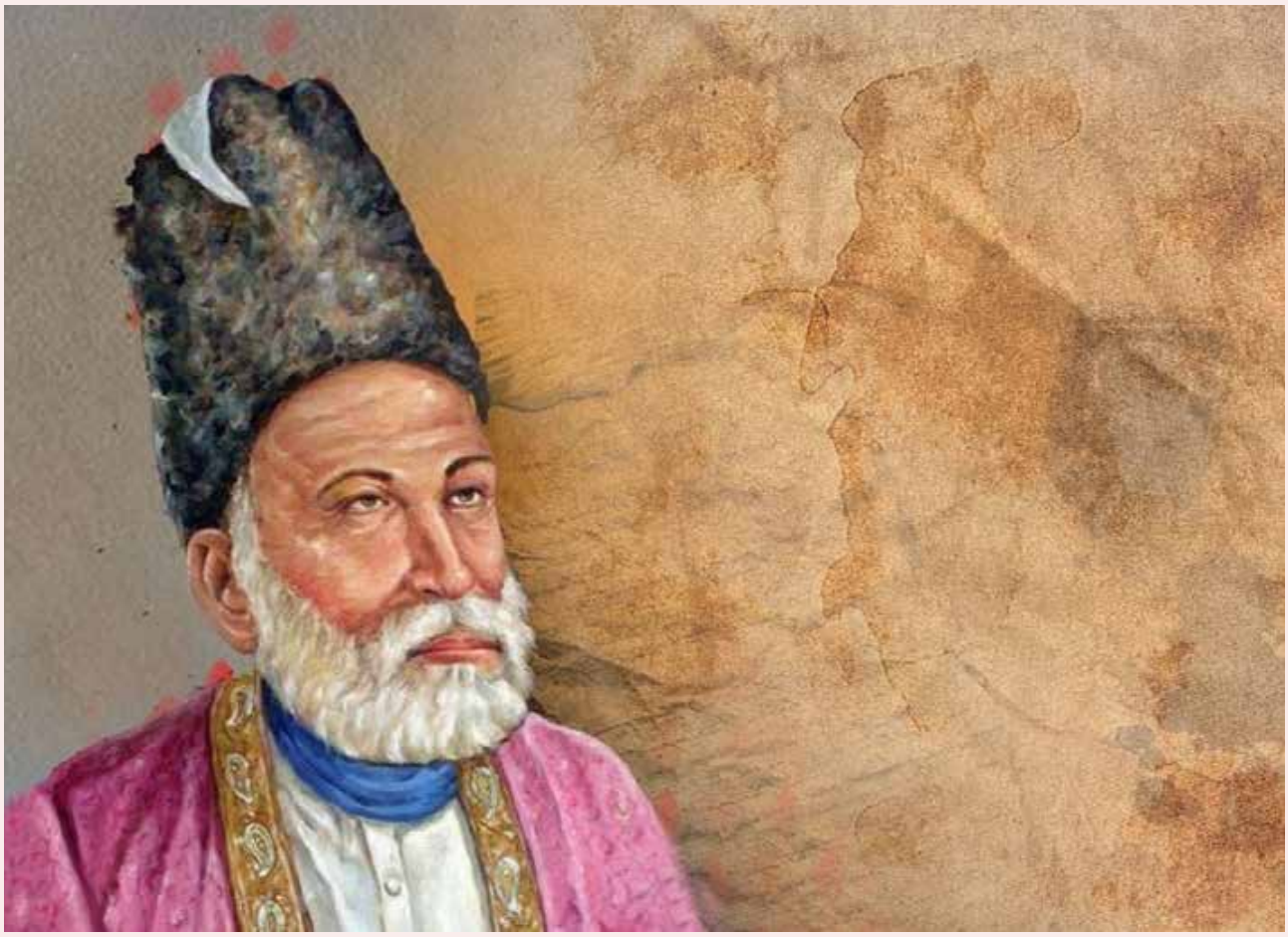

ভ্রমণ

মির্জা গালিবের খোঁজে

রাহেল রাজিব

মির্জা গালিব সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি 'কবি মানস'-এর পাক্ষিক পাঠচক্রে; 'পাঠচক্র রবিবার' থেকে, রেজা ভাই (কবি রেজা হোসাইন) মির্জা গালিব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন; পাঠচক্র শেষে তিনিই আমাদের সবাইকে মির্জা গালিবের অনুবাদ পড়তে দেন। মনে আছে, আয়ান রশীদ চৌধুরী ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সে অনুবাদগ্রন্থটি ছিল দারুণ আকর্ষণীয়, ডিসি সাইজ বই এমনিতেই মনোহরণ করে; এ বইটিও তার ব্যতিক্রম নয়–পড়া শেষে ফেরত দিলেও এ বই অর্ডার দিয়ে ফেলি ভ্যারাইটি স্টোরে, ১৯৯৮ সালে ভ্যারাইটি স্টোর ভারতীয় বই আনত। অর্ডার দিলে মাস খানেকের মধ্যে এনে দিতে পারত। এখন বুঝি সীমান্ত শহর হওয়ার কারণে এসব বই সরাসরি বালুরঘাটে আসত কলকাতা থেকে। দামও কম ছিল। এইটের বৃত্তির টাকায় অনেক বই কেনা হতো, মির্জা গালিবের অনুবাদ আমার নিজে হাতে আসে ডিসেম্বর মাসে। মোহমুগ্ধ পাঠ শেষে ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় পাঠচক্রে আমি মির্জা গালিবের অনুবাদ পাঠ করেছিলাম, পরে বন্ধুরা পর্যায়ক্রমে সে বইটি পড়েছিল। বন্ধু তানিয়া তহমিনা সরকারও (বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় সভায় আলোচনা করে পাঠ করেছিল। মির্জা গালিবের প্রতি এ আবেগ ও মোহ কৈশোরে রেজা ভাই ভালোই জাগিয়েছিলেন। ২০০০ সালে মাধ্যমিকের পরে বালুরঘাট যাওয়াটার একটা বড় কারণ ছিল মির্জা গালিবের পোস্টার কিনে আনা, এ পোস্টারের দোকানের খবর দিয়েছিলেন অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাসের দ্বিতীয় পুত্র টুংকু দা, টুংকু দা ভারতে তাঁর বাবার মতোই পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পড়তেন। আমার পড়ার ঘরে মির্জা গালিবের ১৮ ইঞ্চি সাইজের পোস্টার শোভা পেয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকসহ ঢাকায় আসার পূর্ব অব্দি।

কবি মির্জা গালিবের (২৭ ডিসেম্বর ১৭৯৭–১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯) জন্ম আগ্রায়, প্রয়াণ দিল্লিতে। উর্দু ও ফারসি ভাষার অনন্য ও নান্দনিক কবি–গালিব কখনো জীবিকা হিসেবে কোনো পেশাকে গ্রহণ করেননি। নয় বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেন, সাত বছর বয়স থেকেই দিল্লিতে বসবাস, কবি খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা সূত্রে দিল্লিতে থিতু হোন, দিল্লি মসনদের বেতনভুক্ত ছিলেন, অভিজাত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত মির্জা গালিব বেশ খেয়ালিও ছিলেন। মির্জা গালিবের যাপিত জীবন নিয়ে আগ্রহের কমতি থাকার কথা না উৎসুক ও কৌতূহলি পাঠকের, আমারও আগ্রহ তৈরি হয়। মনে পড়ে, আয়ান রশীদ চৌধুরীর একটি স্মৃতিগদ্য পাঠ করি 'বর্তমান' পূজা সংখ্যায়–সেখানে কবির যাপিত জীবন, দিল্লি বাদশাহর মাসোহারা প্রাপ্তি, অভিজাত জীবনসহ নানা আলোচিত বিষয়গুলোও ছিল। ফলে মির্জা গালিব সম্পর্কে নানা ধরনের লেখা জোগাড় করে পড়তে শুরু করি। পোশাক ও মাথার টুপি বিশেষ ধরনের পরতেন, সবসময় ব্যতিক্রমী জীবন-যাপন করতেন। বাঈজি বিলাস, ফরাসি সুরাপান ও জুয়ায় আসক্ত ছিলেন, তিন মাস জেলও খেটেছেন জুয়া খেলার অপরাধে, শেষাবধি ১৮৬৩ সালে লর্ড এলগিনের আদেশে রাজকবির স্বীকৃতি তাঁকে কবি হিসেবে ও অর্থনৈতিক ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত করায়। তবে কবি মির্জা গালিবের ব্যক্তিজীবনের এসব নানাবিধ ঘটনা তাঁকে আলোচিত ও সমালোচিত যেমন করেছে তেমনি তাঁর কবিতাকে করেছে ঋদ্ধ–মূলত তাঁর কবিতায় তাঁর আত্মজৈবনিক আবহপুষ্টতার একটা নৈমিত্তিক ছাপও স্পষ্ট।

এ যাবৎ ভারতে গিয়েছি প্রায় শ-খানেকবার, ফলে একাধিক রাজ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতার ঝুলি যেমন আছে তেমনি আক্ষেপ আছে অনেক। ২০২২ সালের জুন মাসের দিকে 'শাদি মে জরুর আনা' মুভিটা দেখি, সেখানে একটি দৃশ্য দেখে এতটাই মুগ্ধ হই যে, সেখানে যাবার আগ্রহবোধ হয় এবং অনলাইন রিভিউ দেখে জানা গেল এটি বেনারস শহরের একটি বিখ্যাত ঘাট। খোঁজ লাগালাম পরিচিত কে আছেন, কীভাবে যেতে পারি এবং বেনারস নিয়ে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করলাম। শান্তিনিকেতনের গুণি অধ্যাপক অভ্র বসুর সাথে কথায় কথায় বেনারসের কথা বলতেই, বললেন–নে শ্রীলার সাথে কথা বল। শ্রীলার ফেলো সুবীর ওখানে অধ্যাপনা করেন! আমি তো না চাইতেই বৃষ্টির মতো ঘটনা পেয়ে গেলাম। শ্রীলা বসু নিজেও শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। তাঁর পিএইচডি ফেলো ড. সুবীর ঘোষ। ফোন নম্বর নিয়ে কথাও হলো, আমি সপরিবারে যাব ঘুরতে, উনি আমাদের হোটেল বুক করে দেবেন এবং ঘোরার জন্যে একজন ছেলে দিয়ে দেবেন! কথাবার্তা এতটুকুতেই ছিল। সপ্তাহখানেক পর সুবীর দা ফোন করে বললেন, আসছেন যখন বিভাগে একটা বক্তৃতার আয়োজন করি, সেক্ষেত্রে আপনি হোটেলে না থেকে গেস্ট হাউজে থাকলেন! সানন্দে রাজি! এরপর পরিকল্পনা করলাম! কিন্তু নানা কাজে ভ্রমণ পিছিয়ে যাচ্ছিল–মাস দুয়েক পর সুবীরদার ফোন, দাদা আসছেন যখন আমরা বিভাগ থেকে একটা কনফারেন্স আয়োজন করতে চাই। পুনরায় সানন্দ সম্মত হওয়া এবং সে মাফিক কাজ করে যাওয়া।

ঘোষণা এলো–তাঁর আগেই শিক্ষার্থীদের বললাম দেশভাগ নিয়ে গবেষণা প্রবন্ধ লিখতে। আমার ২৯ জন শিক্ষার্থী গবেষণা প্রবন্ধ শেষাবধি জমা দেয় এবং তাঁরা ৩১ অক্টোবর ও ১-২ নভেম্বর ২০২৩ তিন দিবসীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে আমিসহ ১১ জন স্বশরীরে এবং বাকিরা অনলাইনে উপস্থাপন করে। আমরা কনফারেন্সকে সামনে রেখে ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনা জারি রাখি, পাসপোর্ট করা, ভিসা প্রক্রিয়া শুরু করা! পাসপোর্ট ৩ জন শেষাবধি করতে পারেনি তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাগজপত্রের জটিলতায়। ভিসা অনেকেই পেয়ে যায়–একমাত্র ভবানি পাল ও শিবলি নোমান খান প্রথমবার ভিসা পায়নি, দ্বিতীয়বার আবেদন করে ভবানি পেলেও শিবলি দ্বিতীয়বারও পেল না। ফলে সব আয়োজন ঠিক থাকলেও শেষাবধি ১১ জন আমরা রওনা হই। পিজি স্টুডেন্ট সৈয়দ শিহাব হোসেন, আফিয়া জাহিন বৃন্ত ও আলমগীর কবির, অনার্স ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থী আতিক মেসবাহ লগ্ন, নাজমা বেগম, মেহেনাজ তাবাসসুম স্বীকৃতি, সাথী রাণী রায়, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ভবানি পাল, এমফিল গবেষক মাহমুদা আক্তার ও সহদোরা স্বাতীলেখা লিপিসহ আমরা রওনা করি ২৫ অক্টোবর ২০২৩। কারণ রাজনৈতিক কিছু সিদ্ধান্তের জটিলতার কারণে আমাদের দুই দিন আগে রওনা করতে হয়। কনফারেন্সে উপস্থাপিত পেপারগুলোর দুইখণ্ড সংকলনও আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করে নিয়ে যাই, প্রকাশক নৈঋতা ক্যাফে। মাত্র ২৪ ঘণ্টায় জননী প্রেসের আলম মোল্লা সাহেব ৫০০ কপি এত ঢাউস ঢাউস বই ছেপে-বাঁধাই করে দেন। ২৭ অক্টোবর সকালে আমাদের বাসস্ট্যান্ডে বিদায় জানাতে আসে শিক্ষার্থী শিবলি ও তরিকুল–প্রস্তাব দেই চলো বেনাপোল অব্দি, ঘুরে আসবে। তারাও সানন্দে রাজি হয় এবং চলে যাই আমরা। বাস ছাড়লে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুরে জার্নি ব্রেক–নাশতায় এক প্লেট খিচুড়ি পাঁচজনে ভাগ করে খাওয়া! বেনাপোল পৌঁছে শুরু হলো ঝক্কি–কয়েক হাজার মানুষ বর্ডারে-ভারতে যাবে! সকাল দশটা থেকে বিকাল ৬টা অব্দি বর্ডারে অপেক্ষার এক কঠিন পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে ভারতে প্রবেশ! ভারত-বাংলাদেশ দুই পক্ষের এ জটিলতা কমাতে দুই দেশের কোনো পক্ষের এতটুকু উদ্যোগ ১৫ বছরে চোখে পড়েনি!

বেনাপোল পার হওয়ার পরপরই ভ্রমণসঙ্গী ১০ জনই দারুণ উৎফুল্ল! নতুন দেশ প্রথম বিদেশ ভ্রমণ! যা নজরে আসে সে সবই মোবাইলে ধারণ করতে লেগে গেল! একটা বাসে ১১ জন একসাথে হলে যে হইচই হয়-তার চেয়ে একটু বেশিই হচ্ছিল! অন্যরা প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে তারাও

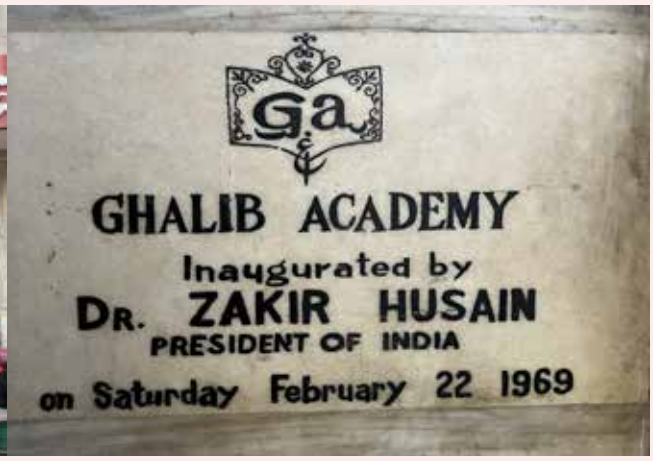

সানন্দ হাস্যে যুক্ত হয়। কলকাতা পৌঁছতে পৌঁছতে মধ্যরাত হয়ে যায়। হোটেলে চেক ইন করেই রাতের খাবার খেতে 'হোটেল আলসালাদিয়া'ই ভরসা! কারণ মধ্য রাতে খোলা বলতে ওটাই। খেয়ে প্রায় সবাই বিশ্রাম নিতে হোটেলে গেল। হ্যাঁ, রওনার পূর্বেই ট্যুরের দুইজন ম্যানেজার ঠিক করে দেই–ছেলেদের পক্ষে সৈয়দ বংশের লোক রাখা হলো, সৈয়দ শিহাব হোসেন এবং মেয়েদের পক্ষে মণ্ডল বংশের আফিয়া জাহিন বৃন্ত! রাতে রাস্তায় গল্প করতে করতে হঠাৎ মনে হলো এই মধ্যরাতে কলকাতায় এদের কী দেখানো যায়! একটা হলুদ ট্যাক্সি ভাড়া করে সোজা হাওড়া ব্রিজ, সাথে খড়গপুর ব্রিজ! দেখে শেষ রাতে ফিরে ঘুম! সকালে উঠে নাশতা সেরেই ট্রামে করে একে একে কলেজ স্ট্রিট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দু/সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কফি হাউজ, শরবতের দোকান প্যারামাউন্ট, মহাবোধি সোসাইটি, বিখ্যাত বইয়ের দোকান দেজ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রথম থিম বুক ক্যাফে অভিযান বুক ক্যাফে, পুঁটীরাম, বোস কেবিন, বসন্ত কেবিন, কলকাতা পুরসভা, জিপিও, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং পথে পথে স্ট্রিট বুফে... যা মেলে তাই মুখে পোড়া ভাগে-জোগে... বিকেলে সবাই নিউমার্কেটে শপিংয়ে... যথারীতি শ্রীলেদার্স ও নিউমার্কেটের টুকিটাকি কেনায় সবার অক্লান্তি মুগ্ধতা, পয়সার চেয়ে দেখে না গেলে যাওয়া যাবে না! তৃতীয় দিন সকালেই কলকাতা সাউথে যাওয়া–যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়সহ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ক্যাথেড্রাল চার্চ, নন্দন দেখে হোটেলে ফেরা এবং বিশ্রাম!

কলকাতা থেকে দুন এক্সপ্রেসে যাব বেনারস, ট্যুর গাইড অয়ন মুখার্জি চলে এসেছে, বেচারা পায়ে ব্যথা পেয়েছে কদিন আগে! বাইক একসিডেন্টে–পূজার সময় পার করে সে পূজার সিজনে আমাদের সাথে চলছে শুধু ইন্দ্রদ্রার কল্যাণে! বাসের টিকিট করা ছিল আমাদের–সেটা ক্যানসেল করে আমরা বিশেষ একটা টিকিট পেয়েছি দুন এক্সপ্রেসের ৬টি! সেখানে একজনের নাম আফিয়া জাহিন! আমাদের সাথেও আছেন একজন আফিয়া জাহিন বৃন্ত! বাকি ৫ জনের জেনারেল টিকিট কেটে আমরা চেপে বসলাম হাওড়ায় দুন এক্সপ্রেসে! ৬ জনের সিটে ১১ জন কীভাবে গেছি সে এক যুদ্ধ–তবে ভ্রমণ আনন্দে সেসব কিছুই না! গল্প-আড্ডা-গান-নাচ কোনোকিছুই বাদ রাখেনি বাচ্চারা, বগির অন্যরাও যুক্ত হয়েছে এ আনন্দে.... বেনারসে আমাদের রিসিভ করতে আসে জুয়েল সরকার, পিএইচডি গবেষক, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরবঙ্গের ছেলে। দারুণ সৎ ও কর্মঠ ছেলে। কাজে-কর্মে সে প্রমাণই মিলল। আমরা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে উঠলাম। চারটে রুম। ছেলেদের ডর্মে ৫ জন ছেলে, মেয়েরা দুই রুমে ২/৩ শেয়ার–একটা ভিআইপি আমার কপালে! বেনারস শহরটা ১৬০০ বছর পুরনো, বনেদি ও ঐতিহ্যবাহী শহর। ১০৮ টা ঘাট রয়েছে... বেনারসের আরেকনাম কাশি, হিন্দিতে ভানারসীও বলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইংরেজিতে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলায় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়–একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি নাম! দুটো ক্যাম্পাস–প্রধানটি ১৪০০ একর, দ্বিতীয়টি ২৬০০ একর, ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সূচক যেমন তেমনি আয়তন ও ১৫৬টি বিভাগ! গবেষণার জন্যে এটির সুনাম রয়েছে দেশ-বিদেশে। গেস্ট হাউজে ফ্রেশ হয়েই আমরা লাঞ্চ করে সোজা অস্যি ঘাটে, সাথে তানজিম পিপাস–বাংলাদেশের ছেলে ওখানে অর্থনীতি পড়ছে। বাংলা বিভাগ অনুরক্ত, কনফারেন্সে পিপাসের পরিশ্রম দেখে মুগ্ধ। বিনয়ী ছেলে–ঘাট মানেই দারুণ আনন্দ বেনারসে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুনিয়র আমিনুল ইসলাম পিএইচডি গবেষক হিসেবে এবছরই সেখানে গেছে, আমিনুল পুরোটা সময় আমাদের দারুণভাবে দেখভাল করেছেন। সুবীর সরকার এক কথায় অসাধারণ, দেখা গেল আমরা ব্যাচমেট বন্ধুত–প্রেম-ভালোবাসা সিক্ত হয়েছি সকলে।

ঘাটে গিয়ে নৌকা ভাড়া করা হয়েছে... দারুণ সব ঘাট ও নামের সাথে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা গল্প রয়েছে লুকিয়ে। শ্মশানে দাহ চলছে–কথিত আছে ১৬০০ বছর থেকে নিরন্তর চিতা জ্বলছে এ ঘাটে! দেশ-বিদেশ থেকে দেহ আসছে দাহ্য করার জন্যে। এখানে ডেড হোমও আছে... মৃত্যু পথযাত্রী মানুষেরা সেখানে এসে ৯০ দিন থাকার সুযোগ পায়... মৃত্যু বেনারসে উদ্‌যাপন! এখানে মানুষ মৃত্যুকে বরণ করতে আসে এবং সানন্দে সে উদ্‌যাপনও করে। সন্ধ্যাআরতি বেনারসের ঘাটের একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি! আমরা নদীতে ঘুরে এসে আরতি দেখলাম। দারুণ মিথিক্যাল ও সাংস্কৃতিক একটা আবহ তৈরি হয়। ভোরেও আরতি হয়, সেটার আকর্ষণও দারুণ। আমাদের সকালের আরতি দেখা হয়নি। রাতে ফিরে আসার পথে লস্যি, গরম দুধ ও রাবরি খাওয়া সকলে মিলে... দারুণ স্বাদ, ভোলবার নয়। তবে বেনারসের বিখ্যাত লস্যি পেহেলবান লস্যি! লঙ্কা গেটের কাছে সেটা- বেনারস গেলে পেহেলবান মিস করবেন না কেউ!

৩১ অক্টোবর কনফারেন্স শুরু–সকালেই সবাই ফরমাল পোশাকে কনফারেন্স হলে গেলাম, সাদরে জয়টীকা দিয়ে বরণ করা হলো সবাইকে, উদ্বোধন শেষে কী-নোট স্পিকার বক্তব্য রাখলেন, আমার বক্তব্য ছিল তৃতীয় দিন, প্যারালাল সেশনে ছেলেমেয়েরা তাদের গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করে সার্টিফিকেট পেল, দেশ-বিদেশের শিক্ষক ও গবেষকদের সাথে পরিচয় ও যোগসূত্র স্থাপিত হলো। সন্ধ্যায় সবাই যাবে বেনারস ঘুরতে... আমরাও বের হলাম। ছোটবোন সুধা পাণ্ডে ও দীক্ষা ভারতী এলো- ওরা নিয়ে গেল পাইকারি মার্কেটে! সুধার কাকা বেনারসের পুলিশ কমিশনার ফলে সুবিধা বেশ ভালোই মিলল। ১৭ খানা শাড়ি কেনা বলো মাত্র ৯ হাজার রুপিতে! যা অন্যরা বিভিন্ন দোকানে কিনে এনেছে অনেক দামে... বাংলাদেশ থেকে যাওয়া অপরাপর শিক্ষকবৃন্দ দামের ফারাক দেখে থ! চেনা না থাকলে সবখানেই ট্যুরিজম ভালো জমায় স্থানীয়রা! বেনারস শহরে বুদ্ধর স্তুপাসহ আরও অনেক বুদ্ধিস্ট মনাস্ট্রি আছে, আছে দারুণ দারুণ সব মন্দির! সুধা ১ নভেম্বর নিয়ে গেল নমো ঘাটে... এখানেই ঐ সিনেমার শ্যুটিং হয়েছে! আসার সূত্র এ ঘাটের অপরূপ দৃশ্যায়ন! এ ঘাটে চা দারুণ মেলে... স্বাদ নেওয়া হলো চায়েরও। কনফারেন্স শেষে আমাদের মূল ভ্রমণ শুরু হলো ৩ নভেম্বর... আগ্রা সোজা! মির্জা গালিবের নাড়িমাটি–আমি এর আগেও একাধিকবার আগ্রায় গিয়েছি, কিন্তু মির্জা গালিবের অলি-গলি অতটা খোঁজা সম্ভব হয়নি। এবার মির্জা গালিবের

জন্মস্থানসহ গালিবের শৈশব-কৈশোরের চেনাপথগুলো দেখে আসা হয়েছে দারুণভাবে–দুচোখে আঁশ মেটেনি–তবু দেখেছি নিরন্তর। ভোরের তাজ, আগ্রা ফোর্ট, ফতেপুর সিক্রি, মাহতাববাগ থেকে দেখা তাজ... সব মিলিয়ে আগ্রা এবার মোঘল সাম্রাজ্য দেখা শিক্ষার্থীদের... আমার দেখা মির্জা গালিবের অলি-গলি! মধ্যরাতে মির্জা গালিবের রাস্তায় হেঁটেছি প্রায় ভোররাত অব্দি! গালিবের আগ্রা জীবন স্বল্প সময়ের হলেও নাড়িমাটির জৌলুস ও অভিজাত জীবনচর্চার রেশ সারাজীবন থেকে গেছে।

আগ্রা থেকে সোজা ট্রেনে জয়পুর, পিংক সিটি! জয়পুরে পৌঁছেই বের হয়ে পড়ি সবাই–রাতের হাওয়া মহল ও পিংক সিটি দেখতে... পথে পিংক পেয়ারা, পিংক ফ্রুটস, রাজস্থানি ঐতিহ্যবাহী নানাপদের মিষ্টি চেখে দেখতে দেখতে হাওয়া মহল দেখা সবার! মুগ্ধতা ও প্রেমের অপর নাম হাওয়ামহল! পরদিন সকালে পুনরায় ভোরের হাওয়ামহল, এরপর পিংক সিটি, জলমহল, আম্বের ফোর্ট, যন্তরমন্তর, হাওয়ামহলের অন্তরমহল, সিটি প্যালেসসহ পথে পথে হেঁটে সারাদিন ক্লান্তি নিয়ে ফেরা এবং আজমিরের উদ্দেশে রওনা হওয়া... আজমিরে আমরা হোটেল পাইনি–রাতে জার্নি। টার্গেট স্টেশনে ব্যাগপত্র রেখে ট্যুর গাইড অয়ন সেটা পাহারা দেবেন, আমরা এক বেলা দেখে আসব–কারণ আমাদের ট্রেনে ফিরতে হবে দিল্লি! যে কথা সেই কাজ! আজমির পৌঁছে যাই রাত ৩টায়... স্টেশনে সবাই ঘুম। স্বীকৃতি বেশ গোছানো–ওর সাথে বেডশিট ছিল সেটা বিছিয়ে ঘুম! এখানে আমার ঠান্ডা লেগে যায় বেশ! ফ্লোরের ঠান্ডা গলায় উঠে আসে! সাথে হালকা জ্বর ছিল বেনারস থেকেই! ঔষধ চলছিল! দুই ম্যানেজার জানতো জ্বরে কতটা কাহিল–ট্যুরে যাবার একদিন আগে রিকশা একসিডেন্টে ঢাকায় ডান হাতের কব্জিতে ব্যথা পেয়েছিলাম ভীষণ–সেটাও ভুগিয়েছে বেশ। কনফারেন্সের একদিন বাম পায়ে ব্যথা পেয়ে কেটেছে–সেটা নিয়ে পুরো ট্যুর করেছি! প্রতিদিন বারনল পাউডার দিয়ে ব্যান্ডএইড মুড়িয়ে কেডস পরা... কারণ প্রায় প্রতিদিনই সবার ১২-৫ কিমি হাঁটা হচ্ছিল! ঘুরতে গেলে তো হাঁটতে হবেই!

ট্রেনে পুরনো দিল্লি স্টেশনে নামতেই রিসিভ করলেন প্রীতম মজুমদার, ইংরেজি সাহিত্যের পিএইচডি গবেষক। আড়াই দিন ছেলেটি আমাদের সময় দিয়েছেন সব কাজ ফেলে–কয়েকমাস আগে ঢাকায় এসেছিল–চেষ্টা করেছিলাম ওকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করতে–সেটার রিটার্ন ভালোবাসায় সে যা করেছে! স্যালুট! দিল্লিতে রেডফোর্ড, কুতুবমিনার, লোটাস টেম্পল, ইন্ডিয়া গেট, প্রেসিডেন্ট ভবন, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজার, জামে মসজিদ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়...চাঁদনিচকসহ সবখানে চষে বেড়ানো হয়েছে। চাঁদনি চকে বিখ্যাত জালেবিওয়ালার রাবরি, সমুচা ও শাহি জিলাপি খেয়েছি সবাই! ৬০০ রুপি কেজি- প্রতি জিলাপি ৬০ রুপি! ১৮৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত ১৩৯ বছর ধরে চলছে এ জালেবির দোকান। ঘিয়ে ভাজা এমন জালেবির স্বাদ সবার মুখে লেগে থাকবে আমৃত্যু! দিল্লি এলে দিল্লিকা লাড্ডু না খেলে চলবে? ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে কেনা হলো দিল্লিকা লাড্ডু! দারুণ জাফরানি স্বাদের লাড্ডু খেয়ে মুগ্ধ সবাই! আমরা দিল্লিতে ছিলাম ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ হোস্টেলে, সেটির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবু কান্ত! শিবুদার কল্যাণে এ হোস্টেলে ডিপ্লোম্যাট জোনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা নিশ্চিন্তে ছিলাম! এটির ভাড়া যেমন সহনীয়–সকালের ব্রেকফাস্ট একেকদিন একেকমতো! শেষদিন সাউথ ইন্ডিয়ান ফুড উপমার স্বাদ অতুলনীয়... মূলত দিল্লিতে নেমেই প্রীতমকে বলেছিলাম মির্জা গালিবের বিষয়ে! তিনিও বেশ আগ্রহী ছিলেন। 'গালিব একাডেমি' ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তে উদ্বোধন হয়, সে সময়ে ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ড. জাকির হুসেইন এটি উদ্বোধন করেন–ভারতবর্ষে এ ঘটনাটিও বিরল, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি 'গালিব একাডেমি' উদ্বোধন করছেন। মির্জা গালিব আমৃত্যু দিল্লি মসনদের স্নেহধন্য ছিলেন, মৃত্যুর পরও তাঁকে নিয়ে ও তাঁর কবিতাচর্চা নিয়ে ভারত সরকারের এ একাডেমি প্রতিষ্ঠাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার নতুন দিক উন্মোচিত করে। গালিব একাডেমির একটি হলরুম আছে যেটি সবসময় খোলা থাকে, নামমাত্র ভাড়ায় সেখানে শিল্প-সাহিত্যের অনুষ্ঠান করা যায়। গালিব একাডেমির গবেষণা সেলটি দারুণ, যে সব ভাষায় মির্জা গালিব অনুবাদ হয়েছে, সব গ্রন্থ সংগ্রহ করা এবং গবেষণা অনুরক্তদের জন্যে সেটাকে যথাযথ সংরক্ষণ করে যাচ্ছে।

ফেরাটা আমাদের ট্রেনেই হবার কথা ছিল! কিন্তু বেনারসে আলাপে আলাপে ট্যুর গাইড অয়ন বলেছিল প্লেনে ভাড়া কম! দেখা গেল ৫২০০ রুপিতে দিল্লি টু ঢাকা! হিসাব না ভেবে আমরা টিকিট কেটে ফেলি! কারণ পথের ক্লান্তি ও ঝক্কি আমরা দেখে এসেছি! বাই রোডে তাই সবার না–যদিও অর্থ অনেক অনর্থের মূল ছিল! সাহস করে নিজেই দিয়ে ফেললাম টিকিটের টাকা! শ্রদ্ধা-স্নেহ-মমতা-প্রেম-ভালোবাসার কাছে টাকা পয়সা উড়ে যায় বাতাসে... ইন্ডিগোর ফ্লাইটে ১০ নভেম্বর ২০২৩ আমরা ঢাকা ফিরি! শিক্ষার্থীদের প্রায় সবারই জীবনে এটাই ইন্টারন্যাশন্যাল ও প্রথম বিমান ভ্রমণ! অনেক অপ্রাপ্তি, সময়ের খামতি ও অর্থাভাবে না দেখা, না খাওয়া অনেক কিছুর আস্বাদন হয়তো বাকি রয়েছে... কিন্তু চৌদ্দ রাত পনেরো দিনের এ ভ্রমণে শিক্ষার্থীরা দেখেছে বিদেশের একাধিক শহর, অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, নানা ভাষার ও নানা বর্ণের মানুষ–এসব স্মৃতি হয়তো তাঁদের চিন্তা মননে ও পঠন-পাঠনসহ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে তুলবে অনেক গুণে...

দিল্লিতে মির্জা গালিবের সমাধি, 'গালিব একাডেমি'সহ মির্জা গালিবের বাড়ি, তাঁর কয়েক প্রজন্ম পরবর্তী উত্তরাধিকার, তাঁর হেঁটে যাওয়া পথে দিনে ও মধ্যরাতে হেঁটে হেঁটে অনুভব করবার চেষ্টা করেছি তাঁর সময় ও চিন্তাকে... মির্জা গালিব আমাকে নিয়ত প্রভাবিত করে... তাই কলকাতা সদর স্ট্রিট থেকে আগ্রায় তাঁর নাড়িমাটির অলি-গলির পথগুলো টেনেছে আমাকে বারবার। এছাড়া যতবার গেছি দিল্লি–সময় কুলিয়ে মির্জা গালিবের সমাধিস্থলে গেছি একবার হলেও... ভ্রমণের আড়ালে হয়তো কলকাতা, আগ্রা ও দিল্লির অলি-গলিতে মির্জা গালিবকেই খুঁজে ফিরেছি আমি চেতন-অবচেতন কিংবা চকিতে-অচকিতে... একজন কবির এ শিল্প বৈ আর কিছু ঝুলিতে নেই, শিল্পপাঠ-আস্বাদনের এ সংযুক্ত ও স্বশরীরী অভিজ্ঞতা ও পাঠের বিকল্প এখানো আমি আবিষ্কার করতে পারিনি! •

আগ্রা থেকে সোজা ট্রেনে জয়পুর, পিংক সিটি! জয়পুরে পৌঁছেই বের হয়ে পরি সবাই–রাতের হাওয়ামহল ও পিংক সিটি দেখতে... পথে পিংক পেয়ারা, পিংক ফ্রুটস, রাজস্থানি ঐতিহ্যবাহী নানাপদের মিষ্টি চেখে দেখতে দেখতে হাওয়ামহল দেখা সবার! মুগ্ধতা ও প্রেমের অপর নাম হাওয়ামহল! পরদিন সকালে পুনরায় ভোরের হাওয়ামহল, এরপর পিংক সিটি, জলমহল, আম্বের ফোর্ট, যন্তরমন্তর, হাওয়ামহলের অন্তরমহল, সিটি প্যালেসসহ পথে পথে হেঁটে সারাদিন ক্লান্তি নিয়ে ফেরা এবং আজমিরের উদ্দেশে রওনা হওয়া... আজমিরে আমরা হোটেল পাইনি–রাতে জার্নি। টার্গেট স্টেশনে ব্যাগপত্র রেখে ট্যুর গাইড অয়ন সেটা পাহারা দেবেন, আমরা এক বেলা দেখে আসবো–কারণ আমাদের ট্রেনে ফিরতে হবে দিল্লি! যে কথা সেই কাজ! আজমির পৌঁছে যাই রাত ৩টায়... স্টেশনে সবাই ঘুম। স্বীকৃতি বেশ গোছানো–ওর সাথে বেডশিট ছিল সেটা বিছিয়ে ঘুম! এখানে আমার ঠান্ডা লেগে যায় বেশ!

রাহেল রাজিব
কবি ও গদ্যকার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

বহ্নি রেগে গিয়েছিল, তার হাত চেপে ধরেছিল সুশান্ত। সাব-ইনস্পেক্টার বলল, আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে আপনারা মেয়েটিকে কিনে এনেছেন।
আর কী রিপোর্ট আছে? বহ্নি জিজ্ঞেস করেছিল।
সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল, আমরা কী এমন লোক যে মিছিলে গেলাম বলে আপনাকে পাঠানো হলো?
আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে। সাব-ইনস্পেক্টার বলতে চেষ্টা করে।
থাকুক, আমরা যে পাচার করতে মেয়েটাকে আনিনি, আমরা যে তাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, সে রিপোর্ট নেই? সুশান্ত খুব শান্ত গলায় বলেছিল।
তর্কাতর্কির পর পুলিস ওঠে। যাওয়ার সময় বলে যায়, মেয়েটার সব তথ্য থানায় দিয়ে আসতে। আরো বলে, মেয়েটাকে যে কিনে আনা হয়নি, এমন কোনো প্রমাণও দিতে হবে, দত্তক নিতে হলে কাগজে কলমে নিতে হবে, রেজিস্ট্রি করে নিতে হবে, সরকারের অনুমতি নিতে হবে, পুলিস ভেরিফিকেশন রিপোর্ট থাকতে হবে, মেয়েটির মা-বাবাকে ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এফিডেবিট দিতে হবে

সুশান্ত বলেছিল, রাত ১০টার পর আসতে হলো এসব শোনাতে?
এস. আই. ক্রুদ্ধ হতে গিয়েও সামলে নিয়েছিল নিজেকে। তারপর কী মনে করে স্থান ত্যাগ করেছিল।

পুলিস চলে যাওয়ার পর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে লতা। তাকে জড়িয়ে ধরে বহ্নি, জিজ্ঞেস করে, ভয় পেয়েছিস পুলিস দেখে?

না, খানসেনা দেখেছিল দিদমা, মরিচঝাঁপিতি পুলিস কি দেখেনি ঠাকমা, দাদু, মা পুলিসে আমার ভয় নাই, খানসেনা, মরিচঝাঁপি, সব আমি দেখিছি, মরিচঝাঁপি আসার আগে রায়পুর রেলস্টেশনে পুলিস কত মেরেছিল, মা পুলিশে আমি ডরিনে, আমি মথুরগঞ্জের মেয়ে।

পুলিস এসেছিল বটে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। আর কে এক সুশান্ত বোস, বহ্নিশিখা বোস মিছিলে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের ভিতর, তারা গেলেইবা কী, না গেলেইবা কী তা বুঝতে পারছিল না থানা। অনিমেষের ক্ষমতা আছে। পার্টির কথায় থানা চলে। তাই সাব-ইনসপেক্টার গিয়েছিল ভয় দেখাতেই। এমন কাজ তাদের করতে হয়। কিন্তু মেয়েটা যে স্কুলে যাচ্ছে তা সত্য। বেশি ঝামেলা করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। এবং ওই দুজনে টেঁটিয়াও বটে। বিপ্লবী অতীত তো। আসেনি থানায়। আর লোকাল কমিটির মেম্বর অনিমেষ বুঝেছিল, 'গ্রামে গ্রামে ডাক পাঠাও, জোট বাঁধো তৈরি হও', তার বাবা-কাকাদের যৌবনকালের শ্লোগান ফিরে আসছে। জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার। মানুষ কী সুন্দর ঘরবন্দি হয়ে ছিল। টিভি দেখছিল, সিনেমা দেখছিল, চলচ্চিত্র উৎসবে আনসেন্সরড ছবি দেখছিল, সৌরভ গাঙুলীতে মজে ছিল, বাঙালির জাতীয়তাবাদে ডুবে গিয়েছিল, সাইনবোর্ডে ইংরিজি লেখায় কালি লেপে দিচ্ছিল, সৌরভ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ছিল, ছেলেমেয়েকে ইঞ্জিনিয়ার করতে, বিদেশে পাঠাতে জীবন পণ করেছিল, আর গাঁ-গঞ্জে মানুষ মাথা নত করে ছিল পার্টির কাছে। জন্ম মৃত্যু বিবাহ, সবই পার্টি নিয়ন্ত্রিত। সবাই ভালো ছিল। অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছিল। সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভেঙে গেল আচমকা। কী করে সব ভুলে মানুষ পথে নেমে এল, সেইটা মাথায় ঢুকছিল না অনিমেষদের। তারা একবার ভাবছিল হাঁড় হিম করা ভয় দেখিয়ে সব থামাবে, আর একবার ভাবছিল, শান্ত হয়ে সবটা দেখে নিতে হবে। তারপর সময় ফিরলে, সব মানুষ ঘরে ফিরে গেলে ধীরে ধীরে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনিমেষ পার্টি অন্ত প্রাণ। সে একটি পরিবারের কাছে হেরে গেল। আবার তার কথায় কেউ কেউ বাইরে না গিয়ে ঘরে বসে তার অজান্তে টিভিতে মিছিল দেখেছে। জানত না ঘরে বসেই পা মিলিয়েছিল সহস্র পায়ে।

মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েকে নিজের স্কুলেই দিয়েছে বহ্নি। সঙ্গে নিয়ে যাবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। স্কুলে বাবার নাম বলাইহরি মৃধা, মায়ের নাম পুষ্পরানি লেখা হয়েছে। তাহলে কেমন করে তোমার মেয়ে হলো বহ্নিদি? উসকে দিতে গিয়েছিল সেই চন্দ্রিমা, অনিমেষের পার্টি আর অনিমেষ যার কাছ থেকে খবর পেয়েছিল। বহ্নিশিখার মেয়ের খবর পেয়েছিল।

বহ্নিশিখা বলেছিল, মেয়ে তো আমার নয়, আমি মানুষ করব শুধু।

ও তো মা ডাকে তোমাকে, তোমরাই তো ওর মা বাবা। চন্দ্রিমা যেন জেরা করছিল তাকে, অ্যাডপ্ট করেছ বহ্নিদি?

বহ্নিশিখা বলেছিল, অ্যাডপ্ট করিনি, পালন করছি, আমি মা, সুশান্ত ওর পিসে, যাদের জিনিস তাদেরই তো থাকবে, সেইটাই তো বিধি।

চন্দ্রিমা মেয়েটি বছর পঁয়ত্রিশ, ধূর্ত চোখমুখ, বলে, তুমি লিখে দাও না ডটার অফ সুশান্ত রায় অ্যান্ড বহ্নিশিখা রায়, পাকা হয়ে যাবে, ওর সুন্দরবনের মা-বাবা খোঁজও পাবে না, তারা আর একটা করে নেবে, ওদের তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং নেই, দ্যাখো গিয়ে তোমায় একটা দিয়ে আর একটা পেটে ধরে বসে আছে।

বহ্নিশিখার গা রিরি করে উঠেছিল। ইস, এই এদের বিরুদ্ধেই মানুষ পথে নেমেছে আজ। এত ঘৃণা নিয়ে গরিবের পার্টি করে? সে বিরক্তিতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু চন্দ্রিমা কি চুপ করে থাকতে পারে, বলে, নিয়ে নাও নিয়ে নাও, একেবারে নিয়ে নাও, পাকা করে নাও, পোকা-মাকড়ের মতো জন্মায় এরা। বহ্নিশিখা বুঝতে পারছিল চন্দ্রিমার তার ভিতরে নিজের ঘৃণা ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। তাকে ফাঁদে ফেলতে চাইছে। অবশ্য তা না হতেও পারে। মানুষ এমন হয়ে গেছে। সততা অসততার তফাৎ বুঝতে পারে না। এমনিই তো করে সবাই। করলে কী হয়েছে? ঘরে বসে বসে, টিভিতে অলীক পৃথিবী দেখে দেখে, মানুষ খুব স্বার্থপর হয়ে গেছে। বহ্নিশিখা বলেছিল, তা হয় না, তুমি বেআইনি করতে বলছ কেন?

বেআইনি কেন হবে বহ্নিদি, তুমি তো ওর ভালোর জন্যই নেবে, কিন্তু এটাও সত্যি এরা খুব অকৃতজ্ঞ, কত কী করা হয়েছে গ্রামে, পঞ্চায়েত দেখছে সব, সামান্য জমি দেবে না, গাড়ির কারখানা, কেমিক্যাল হাব হবে না, তোদের যে ভাত দিচ্ছি আমরা সে কথা ভুলে গেলি, দেশকে কিছু দিবি না?

বহ্নিশিখা আর কথা বাড়ায়নি। চুপ করে থাকাই ভালো। কথাগুলো তার গায়ে লাগছিল।

তখন জমি অধিগ্রহণ নিয়ে গোলমাল চলছিল। প্রথম ধাক্কায় যে মিছিল রাজপথ প্লাবিত করেছিল, তা থেমেছিল। অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল নানা পরিকল্পনা করে আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছিল। আর ছাত্র-যুবরাও পথে নেমেছিল। এইভাবে সময় যাচ্ছিল। সুশান্ত টের পাচ্ছিল পায়ের তলার মাটি আগুন হয়ে উঠছে অনেক বছর বাদে। সেই বসন্তের আগুন। বজ্র নির্ঘোষ বুঝি শোনা যাচ্ছে আবার।

আট.

এখন বর্ষা অনেক দেরি করে আসে। আগে আষাঢ় শ্রাবণে খুব বিষ্টি হতো মা।

হেসে ফেলে বহ্নি। পাকা বুড়ির মতো এমন কথা বলে মেয়েটা। আগে মানে কত আগে? অনেক বছর আগে। তখন আষাঢ় এলেই গুরুগুরু মেঘ,

ইশেনে মেঘ নৈর্ঋতে মেঘ
মেঘ অগ্নি কোণে
বায়ু কোণ উজাইল মেঘে
উজাইল দিনমানে।

গুনগুন করে মেয়ে। সেই আষাঢ়ের মেঘ আর আসে না। কেন আসে না? সেই বিরামপুরা পোড়ার দেশ, সেই দেশে বৃষ্টিই ছিল না। পাহাড় আর পাহাড়, বন-জঙ্গলে বাঘ, ভালুক, কেউটে সাপ। শুখা জমিতে জল পড়লে শুষে নেয় তো ফসল হবে কী করে। যবে বিরামপুরা, দণ্ডকারণ্যে পাঠাল রিফিউজিদের তবে থেকেই আষাঢ়ের মেঘ উধাও হয়ে গেল। মেঘ তো তাহাদের পিছু পিছু সেই দেশে গিয়ে হারিয়ে গেল। সেই দেশ তো মেঘের দেশ নয়, যেমন ছিল না পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদেরও। উদ্বাস্তুরা ভিটে হারিয়ে গাঙ পানি, মেঘ বৃষ্টি হারিয়ে বিরামপুরায় গিয়ে পড়েছিল।

আষাঢ় গেল। শ্রাবণ গেল। ভাদ্র আসতে না আসতে মেয়ে উতলা হয় গাঁয়ের জন্য। সেদিন বিকেল থেকে নেমেছে খুব। নিম্নচাপ হয়েছে বঙ্গোপসাগরের গভীরে। ঝড় আসছে। লতা বলল, খুব ভয় করে মা, সাঁইবাবুলে ঘিরে দিয়েছে বাড়ি, কিন্তু হাওয়া যখন ওঠে, সাঁইবাবুল ঠেকাতে পারে না সবটা, তবু হাওয়া ঠেকায়।

কেমন করে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে। কত কথা জানে এই মেয়ে এই বয়সে!

বাতাস ঠেকানোর জন্যে সাঁইবাবুলের বন করতে বলেছে পঞ্চায়েত, কত বড় হলো কেডা জানে, ফি বছর ঝড়ে ঘর ভাঙে মা, বিষ্টিতে গাঙ উঠে আসে জমিনে।

বহ্নিশিখা কখনো সুন্দরবনে যায়নি। গ্রাম বলতে সে চেনে পুরুলিয়া, অযোদ্ধা পাহাড়, বেড়ো পাহাড়, জয়চণ্ডী পাহাড়, মধুকুণ্ডা, পছন্দপুর, রাঙামাটি, শালতোড়া, সে প্রায় লতার বলা বিরামপুরার মতো দেশ, কিন্তু বহু বছরের কর্ষণে কর্ষণে নরম হয়েছে অনেক। সেই মাটি ফসল দেয়। আর ছোট-বড় পাহাড় থেকে মেঘও নেমে আসে। মেয়ে কত রকম মেঘের গল্প করে মা বহ্নির সঙ্গে। এত কি জানত বহ্নিশিখা? বুঝতে পারে জীবনটা ফাঁকিই পড়ে গেছে, এখন যা শুনছে, তা বুঝি গতজন্মের কথা। বর্ষা নামল সেই ভাদ্রে। মেয়ে উতলা হয়। ভাদ্র মাসে তাদের চাষ নষ্ট হয় ফি-বছর। যে বছর বাঁচে, সে বছর পুণ্যের বছর। ভাদ্র এয়েছে মা, ভিটে পড়ল কি না কে জানে। মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। কেউ দেয় গোলপাতার চাউনি,

কেউ টিন লাগায়। টিনের চাল টেকে ভালো, কিন্তু তেমন বাতাস যদি ওঠে তা উড়ে চলে যায় গাঙের দিকে। এমনি হয়েছিল তাদের স্কুলে। কিন্তু মা আগের দিনে, যখন আমরা আমাদের সেই গাঙ কপোতাক্ষর ধারে থাকতাম, আম, কাঁঠাল, সজনে, নিম, ডেওয়া, আর সুপুরি নারকেলে ঘেরা থাকত ভিটে, ঝড়বাদলে কিছুই করতে পারত না। গাছগাছালি মানুষের জীবন বাঁচায় মা। ঝড় বাদল আটকায়।

তুই কী যে বলিস লতা!

আমি না, আমার ঠাকমা বলে। হাসে কালো মে য়ে। বহ্নিলতা।

শোনো মা, এদিকি গাঙ উঠে পড়ে মাঠ-জমিনে, আর সেদিকি যখন ঝড় আসে, শোঁ শোঁ শোঁ, বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ে, শোনো মা এক সন্ধের আগে সেই দেশে ঝড় এল, ভিটের টিনে এসে ধাক্কা মারে বায়ু, ঠাকমা শুধু গম্ভী টানে,

বায়ু কোণেতে পবন নন্দন
মহাবলবান
তি-ভুবনে নাহি বীর
যাহার সমান।
পচ্চিমে বরুণদেব
জলের অধিপতি
মেঘগণ সঙ্গে যার
সতত বসতি।
যাও মেঘ অই দিকে,
দূরদেশ পার
হইয়ো পবনদেবের
কণ্ঠে পুষ্পহার।

ও মা, শোনো মা, বাতাস উঠলি এমন কইলে বাতাস দিক বদল করে চলে যায়। লতা বোঝায়।

বহ্নিশিখা বলে, তুই জানিস সব?

জানি মা, জানি, এমন ঝড় উঠল সেবার, সব ভিটের চাল উড়ে যেতে লাগল, তখন দিলাম মন্ত্র, বায়ু ঘুরে গেল, তারপর কী হলো যদি শোনো, একটা পাহাড়, তার নাম নিমকূট, বায়ু সেই পাহাড় উড়ায়ে নিয়ে চলল, মা, মা, যদি দেখতে গগন দিয়ে নিমকূট পাহাড় উড়ে যায়, দশদিক আঁধার হয়ে আসে, অতবড় পাহাড়, ঝড়ে উড়ছে সে, এমন সে ঝড়ের শক্তি, আসলে সে তো পবনদেব, পবনদেব পাহাড় উড়োয় নিয়ে চলছে, সেই পাহাড়ে শুধু নিমগাছ, গাছেরাও উড়ছে, হ্যাঁ, মা সেই পাহাড়ি দেশে নাকি গাছেরা রাত্তিরে হেঁটে চলে বেড়াত, কত রকম ভূত-পেরেত চলে বেড়াত। গুনগুন করে বলতে থাকে লতা।

তুই দেখেছিলি? হাসে বহ্নিশিখা।

হ্যাঁ, আমিই দেখেছি, হ্যাঁ দেখেছি, যে গাছটা যেখেনে থাকার কথা সে গাছটা সেখেনে নেই, একটা গাছ চলে গেল দশমাইল দূরে, আর একটা গাছ হেঁটে এল বিশ মাইল ওপার থেকে।

কেন হেঁটে এল? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

এমনি হেঁটে এল, কোনো কোনো গাছ আছে ভবঘুরে, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বহ্নিলতা বলে।

কেমন গাছ সে?

সে হলো সতীশবাবুর মতো। বহ্নিলতা নিশ্চিত হয়েই বলল।

সতীশবাবু কে?

তিনিই তো এসে বলেছিলেন নিজের দেশে ফিরতে হবে, সুন্দরবন, তিনি ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, মিটিং করতেন, বলতেন উদ্বাস্তুদের নিজ দেশে যেতে হবে, মানা ক্যাম্প, বেতুল জেলার ক্যাম্প, সব ঘুরে ঘুরে ওই কথা বলতেন, বড় গাছ, বটবিক্ষ মা। গতজন্মের কথা শোনায় যেন বহ্নিলতা।

মা মেয়ের কথা হয় রাত্তিরে শুয়ে। মেয়ে এমন কথা বলে, যা শুনতে কান পেতে থাকে সুশান্ত। সুশান্ত বলে, সবই ঠিক চলছিল। থিতিয়ে যাচ্ছিল উন্মাদনা। অনিচ্ছুক আর ইচ্ছুক চাষির জমি নিয়ে দর কষাকষি চলছিল, কিন্তু পরের ফাগুনে নন্দীগ্রামের জমি দখল করতে গিয়ে আবার উত্তাল হলো সদর মফস্বল। শুনছিল অতনু আর কুন্তলা। তারা ট্রেনে এসেছে। তারপর অটো রিকশা। একসঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম, হুগলির সিঙ্গুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা, শালবনি, নেতাই, লালগড় জঙ্গলমহল উত্তাল হয়ে উঠল। এসব খুব জানে কুন্তলা অতনু, তখন তাদের মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। তারা কি পথে নেমেছিল? না নামেনি। তাহাদের তো ফুরায়েছে জীবনের সব লেনদেন। আর তাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে এসে লোকাল কমিটি থেকে বলে গিয়েছিল, ঘরোয়া সভায় যেতে, সব মিথ্যে, যা ঘটছে তারচেয়ে বেশি বলছে লোকে, আপনারা আসুন অমুক তারিখে, আপনাদের সঙ্গে আমরা বসব, বুঝতে হবে সরকার কী চায়, আপনাদের সঙ্গে বসতে হবে।

সুশান্ত বলে, তাদের কাছে এক সকালে হাজির অনিমেষ কুণ্ডু, সহাস্য মুখে ডাক দিলো তার নাম করে।

সুশান্ত বলে, তখন সকাল ৯টা, অনিমেষ এল একটি কার্ড নিয়ে, আজ বিকেল ৫টায় টাউন হলে মিটিং, আপনি আসুন, মন্ত্রী সব বুঝিয়ে বলবেন।

তখন লতা বেরিয়ে এসেছে। লতা খুব কৌতূহলী। শুনছে। লতাকে দেখে অনিমেষ বলল, বাহ, খুব ভালো আছ তো, নাম কী?

বহ্নিলতা মৃধা।

বাবার নাম? অনিমেষ যেন জেরা করছিল।

শ্রী বলাইহরি মৃধা।

তখন সুশান্ত বলেছিল, আমি তো অন্য কাজে থাকব ঐদিন, আমার তো যাওয়া হবে না অনিমেষ।

সে কী, কেন? অনিমেষ বিস্মিত হয়েছিল।

আমাকে চন্দননগর যেতে হবে অনিমেষ, জরুরি কাজ। সুশান্ত বলেছিল।

আমরা নির্বাচিত কিছু মানুষকে ডাকছি, আপনারা বুঝুন সরকার কী করতে চায়।

আমার কোনো উপায় নেই অনিমেষ, আমাদের এক কমরেড খুব অসুস্থ, আজ আমি যাব বলে কথা দিয়েছি, আমার জন্য শ্যামনগর স্টেশনে অপেক্ষা করবে একজন, গঙ্গা পেরিয়ে যাব।

কাল যাবেন না হয়। অনিমেষ অনুনয় করেছিল প্রায়, আমরা বিশিষ্টজনদের ডাকছি দাদা।

তুমি যাওনি? শুনতে শুনতে জিজ্ঞেস করেছিল অতনু।

না অতনু যাইনি। সুশান্ত বলে।

পারলে? অতনু বিস্মিত হয়, তুমি জানতে সরকার বদল হয়ে যাবে, ওদের ক্ষমতা থাকবে না?

আমি তো গণক নই, যে সরকারই আসুক, আমি কী করব, তা নয় অতনু, আমাদের কমরেড আনন্দ মন্ডল তখন মৃত্যুপথে, আনন্দদার সঙ্গে রুটি ভাগ করে খেয়েছি পুরুলিয়ায়, জেল খেটেছি একসঙ্গে, উনি আমার চেয়ে বছরদশের বড় ছিলেন, অধ্যাপক ছিলেন বাঁকুড়ার একটি কলেজে, চাকরি ফেলে চলে এসেছিলেন বিপ্লবীদলে, আমি তাঁর খবর পাইনি বহুদিন, সেদিনই যাব ঠিক, আমি সেখানে না গিয়ে কেন যাব মন্ত্রীর সভায় তাঁর ছাত্র হতে?

গিয়েছিলে চন্দননগর? অতনু জিজ্ঞেস করেছিল।

সুশান্ত বলল, বহ্নিশিখা আর বহ্নিলতা, দুজনই গিয়েছিল আমার সঙ্গে।

অতনু আর কুন্তলা শুনছে বহ্নিলতাকে পাওয়ার বৃত্তান্ত। এখন আর লতাকে নিয়ে কোনো অসুবিধে হয় না। শুধু নখ-দন্তহীন অনিমেষ তার সঙ্গে কথা বলে না। দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। কথা বলতে গেলে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, জবাব দেয় না। মন্ত্রীর সভায় না গিয়ে তার কথা অমান্য করেছে সুশান্ত রায়, সেই অপমান সে সহ্য করতে পারেনি। যেন সুশান্ত সেই সভায় গেলে অনিমেষরা ক্ষমতা হারাতো না। সে ঠারে ঠোরে একে ওকে বলেছে, তখনই যদি ক্ষমতা প্রকাশ করে মেয়েটিকে সুন্দরবনে ফেরত পাঠাতে পারত, তাহলে সুশান্ত রায় আত্মসমর্পণ করত তার কাছে ঠিক। ক্ষমতাকেই সকলে মান্য করে। সুশান্ত রায় যে মেয়েটাকে কিনে এনেছে এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। নখদন্তহীন ব্যাঘ্রের তেজও কম নয়। যেভাবে হোক যে কোনো কারণে হোক সুশান্ত তাকে 'না' বলেছে। আর তাই হয়ে উঠেছে গোপন প্রতিদ্বন্দ্বী।

• চলবে...

Uttar Pradesh

একনজরে উত্তরপ্রদেশ

দেশ	ভারত
অঞ্চল	উত্তর পূর্ব ভারত
রাজধানী	লখনউ
জেলা	৭৫টি
প্রতিষ্ঠা	৯ নভেম্বর, ২০০০
সরকার	
• রাজ্যপাল	শ্রীমতী আনন্দিবেন প্যাটেল
• মুখ্যমন্ত্রী	যোগী আদিত্যনাথ
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট (৪০৪টি আসন)
• লোকসভা	৫টি আসন
• রাজ্যসভা	৩টি আসন
• হাইকোর্ট	এলাহাবাদ হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	২,৪৩,২৮৬ বর্গকিমি (৯৩,৯৩৩ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	৪র্থ
জনসংখ্যা (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
• মোট	২৪ কোটি+
• ক্রম	১ম
• ঘনত্ব	৮২০/বর্গকিমি (২,১০০/বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৬৯.৭%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় মান সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	IN-UP
সরকারি ভাষা	হিন্দি ও উর্দু
ওয়েবসাইট	www.Ro.gov.in

শ্রীমতী আনন্দিবেন প্যাটেল
রাজ্যপাল

শ্রী যোগী আদিত্যনাথ
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

উত্তরপ্রদেশ

সৈয়দ শিহাব হোসেন

উত্তর ভারতের সমভূমি অঞ্চলের একটি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। যা দুটি প্রধান নদী গঙ্গা ও যমুনার মিলনস্থলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে। রাজ্যটি তার সম্পদ, স্থাপত্য, ইতিহাস, উৎপাদন, শিল্প-কারুশিল্প ও নদী দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে আছে। হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত এ ভূমিটি প্রভু, প্রভুরাম, ভগবান কৃষ্ণ, জওহর লাল নেহরু, চন্দ্রশেখর আজাদসহ অনেক বিদ্রোহী নেতাদের জন্মস্থান। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল 'যুক্তপ্রদেশ' নামে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল। ১৯৫০ সালে এর নাম বদলে উত্তরপ্রদেশ রাখা হয়। উত্তরপ্রদেশ ভারত তথা বিশ্বের অন্যান্য সকল উপজাতীয় অঞ্চলের মধ্যে জনবহুল। শিল্প-সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ লখনউ এ রাজ্যের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। রাজ্যের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে গাজিয়াবাদ, মোরাদনগর, বেরোলি, কানপুর, বারাণসী ও আলিগড় অন্যতম। ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর উত্তরপ্রদেশের হিমালয়সংলগ্ন অঞ্চলটিকে বিচ্ছিন্ন করে 'উত্তরাঞ্চল' (অধুনা উত্তরাখণ্ড) রাজ্য গঠিত হয়

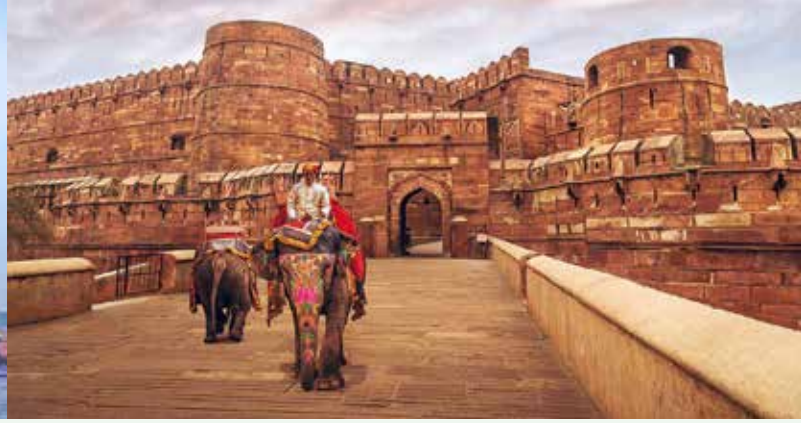

ইন্দো-গাঙ্গেয় সমভূমির কেন্দ্রস্থলে থাকা অবস্থায় উত্তরপ্রদেশ প্রায় সবসময়ই উত্তর ভারতীয় রাজ্যের ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। যাকে সাধারণত পাঁচটি স্বতন্ত্র যুগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা–প্রাগৈতিহাসিক যুগ, বৌদ্ধ-হিন্দু যুগ, মুসলমানদের শাসন, ব্রিটিশ শাসন ও আধুনিক যুগ (স্বাধীনতা পরবর্তী)। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে জানা গিয়েছে, আধুনিক উত্তরপ্রদেশ ভূখণ্ডে ৮৫ থেকে ৭৩ হাজার বছর আগে প্রস্তর যুগে হোমো সেপিয়েন্স শিকার-সংগ্রহকারীরা বাস করত। প্রতাপগড়ের কাছে ২১ থেকে ৩১ হাজার বছরের পুরোনো মধ্য ও প্রাচীন প্রস্তরযুগের এবং খ্রিষ্টপূর্ব ১০৫৫০-৯৫৫০ মেসোলিথিক (পুরোনো ও নতুন প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী সময়ের) মাইক্রোলিথিক যুগের জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতসহ বৈদিক সাহিত্য গাঙ্গেয় সমভূমি হিসেবে এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করে। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শাসক যেমন চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এ অঞ্চল শাসন করেছিলেন। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে লোকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদে বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ভগবান বুদ্ধ এ অঞ্চলে তাঁর ধর্মোপদেশ প্রচার শুরু করেন–যার ফলস্বরূপ বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। গুপ্ত বংশের আবির্ভাবের সাথে সাথে বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয় ঘটে এবং হিন্দুধর্ম প্রাধান্য পায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ থেকে ১৫০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতা ও হরপ্পা সংস্কৃতি থেকে লৌহযুগীয় বৈদিক সভ্যতার সূচনাকালে পশুপালন ও কৃষিকাজ আরও বিকাশ লাভ করে। পরবর্তী সময়ে দিল্লি সালতানাতের যুগ আসে যেখানে মুঘলরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল এ অঞ্চল শাসন করেছিল। শাহজাহান, আকবর ও অনন্য মুঘল শাসকেরা এ অঞ্চলটিকে সর্বোত্তম স্থাপত্যের জন্য অবদান রাখেন। সম্রাট শাহজাহান নির্মাণ করেন বিশ্বের অন্যতম স্মৃতিস্তম্ভ তাজমহল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, সম্রাট আকবর ফতেপুর সিকরি নির্মাণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং এর স্থাপত্যশৈলির নির্দেশনাও দিয়েছিলেন। আঠারো শতকে ব্রিটিশ শাসন শুরু হয়ে উনিশ শতক পর্যন্ত তা স্থায়ী ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অঞ্চলটি আগ্রা ও অযোধ্যের সংযুক্ত প্রদেশের অধীনে আসে। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পর ১৯৫০ সালে যুক্তপ্রদেশের নাম পাল্টে 'উত্তরপ্রদেশ' রাখা হয়। এ রাজ্য থেকে সাতজন ব্যক্তি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। ভারতীয় সংসদের লোকসভায় এই রাজ্যের প্রতিনিধিসংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রশাসন পরিচালনার কাজে এই রাজ্যের গতি শ্লথ। ১৯৯৯ সালে উত্তরপ্রদেশের উত্তরাংশের জেলাগুলো নিয়ে উত্তরাখণ্ড রাজ্য গঠিত হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান : উত্তরপ্রদেশের আয়তন ২,৪৩,২৯০ বর্গকিলোমিটার যা ভারতের মোট ভূখণ্ডের ৬.৮৮%। এটি আয়তনের দিক থেকে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য। রাজ্যের জনসংখ্যা ২০ কোটিরও বেশি। জনসংখ্যার দিক থেকে উত্তরপ্রদেশ ভারতের বৃহত্তম রাজ্য এবং বিশ্বের বৃহত্তম প্রাদেশিক রাজনৈতিক বিভাগ। এই রাজ্যটি ভারতের উত্তরাংশে নেপাল রাষ্ট্রের সীমানা বরাবর অবস্থিত। রাজ্যের উত্তর সীমায় হিমালয় পর্বতমালা অবস্থিত। কিন্তু রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলই সমভূমিতে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের পশ্চিম দিকে ভারতের রাজস্থান রাজ্য; উত্তরপশ্চিমে হরিয়ানা ও দিল্লি; উত্তর দিকে উত্তরাখান্ড রাজ্য ও নেপাল রাষ্ট্র; পূর্ব দিকে বিহার রাজ্য; দক্ষিণপূর্বে ঝড়খান্ড রাজ্য; দক্ষিণ দিকে গাজিয়াবাদ এবং দক্ষিণপশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য। পার্বত্য অঞ্চল, সমভূমি, উপত্যকা ও মালভূমি অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি ভিন্নভিন্ন ধরনের হয়। ভাভর অঞ্চল থেকে তরাই অঞ্চলে বড়ো বড়ো ঘাস জন্মায়। এই অঞ্চল গভীর বনাঞ্চল ও জলাভূমিতে আকীর্ণ। ভাভরের পাশেই সংকীর্ণ আকারে তরাই ভূখণ্ড অবস্থিত। সমগ্র পলিগঠিত সমভূমি অঞ্চলটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমটি হলো পূর্ব উত্তরপ্রদেশ। ১৪টি জেলা নিয়ে গঠিত এ অঞ্চলে খরা ও বন্যা ঘনঘন দেখা দেয়। তাই এটিকে অভাবগ্রস্ত এলাকা বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদুটি অঞ্চল মধ্য ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশে ৩২টি বড়ো ও ছোটো নদী আছে। এগুলোর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সরযূ, বেতোয়া ও ঘর্ঘরা প্রধান এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্র নদী বলে স্বীকৃত। হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে শিবালিক পর্বতমালায় 'ভাধর' নামে বড়ো বড়ো পাথরের স্তর দেখা যায়। রাজ্যের দৈর্ঘ্য বরাবর পার্বত্য ও সমতল এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি তরাই ও ভাভর নামে পরিচিত। এখানে গভীর বনাঞ্চল দেখা যায়। এ বনাঞ্চল ভেদ করে অনেক ছোটো ছোটো নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে এ নদীগুলো খরস্রোতা হয়ে ওঠে।

উত্তরপ্রদেশের জলবায়ু আর্দ্র উপক্রান্তীয় ধরনের। এই রাজ্যে চারটি ঋতু দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশি থাকে। এ সময় অঞ্চল ভেদে এ রাজ্যের তাপমাত্রা ০ সেন্টিগ্রেট থেকে ৫০ সেন্টিগ্রেটের মধ্যে থাকে। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৬৫০ মিলিমিটার। অন্যদিকে পূর্ব ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ মিলিমিটার। মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখা এই রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের জন্য দায়ী। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এই রাজ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। উত্তরপ্রদেশে বৃষ্টির পরিমাণ সাধারণত বছরে ১৭০ মিলিমিটার (পার্বত্য অঞ্চলে) থেকে ৮৪ মিলিমিটারের (পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ) মধ্যে থাকে।

উত্তরপ্রদেশে খরা ও বন্যা প্রায়ই দেখা যায়। বিন্ধ্য পর্বতমালা ও মালভূমির জলবায়ু উপক্রান্তীয় প্রকৃতির। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ থেকে ১২০০ মিলিমিটার। মার্চ থেকে জুন গ্রীষ্মকাল। এই সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৮ সে. (৮৬ থেকে ১০০ ফা.)-এর মধ্যে থাকে। আপেক্ষিক আদ্রতা সাধারণত কম (২০%-এর কাছাকাছি) থাকে। সারা বছরই ধুলোর ঝড় উঠতে দেখা যায়। বর্ষাকালে লু নামে গরম হাওয়া সারা উত্তরপ্রদেশে প্রবাহিত হয়। উত্তরপ্রদেশ ৭৫টি জেলায় বিভক্ত। 'হিন্দি' প্রত্যেকটি জেলারই প্রধান ভাষা তথা রাজ্যের সরকারি ভাষা।

জীবজগৎ : উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের জৈবসম্পদ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ২০১১ সালের হিসাব অনুসারে, এই রাজ্যের বনাঞ্চলের মোট আয়তন ১৬,৫৮৩ কিমি–যা রাজ্যের মোট ভৌগোলিক আয়তনের ৬.৮৮%। ব্যাপক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যেও প্রাণিজ ও উদ্ভিজ সম্পদের বৈচিত্র্য নষ্ট হয়নি। উদ্ভিদ, বড়ো ও ছোটো স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ ও কীটপতঙ্গের বিভিন্ন প্রজাতির দেখা মেলে এ রাজ্যের নাতিশীতোষ্ণ উচ্চ পার্বত্য বনভূমিগুলোতে। বনাঞ্চলে এবং বাগিচাগুলোতে ভেষজ উদ্ভিদও পাওয়া যায়। গঙ্গা ও তার শাখা নদীগুলো বিভিন্ন ধরনের ছোটো ও বড়ো সরীসৃপ, উভচর, মিষ্টি-জলের মাছ ও কাঁকড়ার বাসস্থান। বাবুল জাতীয় শ্রাবল্যান্ড বৃক্ষ ও চিঙ্কারা প্রভৃতি পশুর দেখা মেলে আর্দ্র বিন্ধ্য অঞ্চলে। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পাখিও দেখা যায়। সাধারণ পাখির মধ্যে পায়রা, ময়ূর, বনমোরগ, ব্ল্যাক প্যাট্রিজ, পাতি চড়ুই, সংবার্ড, ব্লু জে, প্যারাকিট, কোয়েল, বুলবুল, নাকতা হাঁস, মাছরাঙা, কাঠঠোকরা, কাদাখোঁচা ও টিয়াপাখি উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের পাখিরালয়গুলো হলো বাখিরা অভয়ারণ্য, জাতীয় চম্বল অভয়ারণ্য, চন্দ্রপ্রভা অভয়ারণ্য, হস্তিনাপুর অভয়ারণ্য, কাইমুর অভয়ারণ্য ও ওখলা অভয়ারণ্য।

রাজ্যের অন্যান্য প্রাণিসম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গিরগিটি, কোবরা, ক্রেইট ও ঘড়িয়াল। বিভিন্ন ধরনের মাছের মধ্যে মহাশোল ও ট্রাউট উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের কিছু বন্যপ্রাণী প্রজাতি সম্প্রতি বিলুপ্ত ঘোষিত হয়েছে। অন্যদিকে গাঙ্গেয় সমভূমির সিংহ ও তরাই অঞ্চলের গণ্ডার বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার আইন করে কিছু প্রাণী রক্ষার চেষ্টা করলেও অনেক প্রজাতিই বর্তমানে বিপন্ন।

জনসংখ্যা : উত্তরপ্রদেশ একটি জনবহুল রাজ্য এবং এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও বেশি। ১৯৯১-২০০১ সময়ে এ রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৬% বৃদ্ধি পায়। ২০১১ সালের ১ মার্চের হিসাব অনুসারে, উত্তরপ্রদেশের জনসংখ্যা ১৯৯,৫৮১,৪৭৭। জনসংখ্যার দিক থেকে এটি ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। ভারতের সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এ রাজ্যের অবদান ১৬.১৬%। রাজ্যের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮২৮ জন। হিন্দু ধর্ম ৭৯%, ইসলাম ধর্ম ২০%, অন্যান্য ১%। এটি ভারতের সর্বাধিক জনসংখ্যার ঘনত্ববিশিষ্ট রাজ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, এ রাজ্যের সাক্ষরতার হার ৭০%।

পর্যটন : শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে আকর্ষণীয় কিছু দর্শনীয় পর্যটন স্থান আছে এবং সেগুলোর সাথে নান্দনিক কিছু স্মৃতিস্তম্ভও যুক্ত রয়েছে। ৭১ মিলিয়নের বেশি পর্যটক আগমনের মাধ্যমে প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ। রাজ্যে সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূসংস্থান, স্পন্দনশীল সংস্কৃতি, উৎসব, মিনার এবং প্রাচীন মন্দির রয়েছে। এ রাজ্যে অনেক ঐতিহাসিক, নৈসর্গিক ও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র আছে। আগ্রা, বারাণসী, পিপরাওয়াল, কানপুর, বালিয়া, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, লখনউ, ঝাঁসি, এলাহাবাদ, বুদাউন, মিরাট, মথুরা ও জৌনপুর তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

আগ্রা : তাজমহল এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত আকর্ষণের সাথে আগ্রা একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে। যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত আগ্রা মুঘল যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিফলিত করে। সমাধি, বাগান, প্রাসাদ, দুর্গ এবং মসজিদসহ আগ্রাজুড়ে মুঘল সাম্রাজ্যের স্মৃতিস্তম্ভগুলো পাওয়া যায়। আকবরের সমাধি এবং শাহজাহানের বাগানের মতো সাংস্কৃতিক সম্পদের জন্য পরিচিত আগ্রা উত্তরের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্থানগুলোর মধ্যে একটি।

বারাণসী : বারাণসী বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর মধ্যে একটি। ভারতের পবিত্রতম শহরগুলোর মধ্যে বারাণসী মোহনীয় এবং মন্ত্রমুগ্ধ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার। এ শহরে অন্যান্য পর্যটন স্থানগুলোর চেয়ে মন্দিরের সংখ্যা বেশি এবং এখানকার ঘাটগুলো দেখতেও চমৎকার। বারাণসী ভগবান শিবের শহর হিসেবে পরিচিত। মহিমান্বিত স্থানটিতে একটি প্রশান্তিদায়ক পরিবেশ রয়েছে। সমগ্র ভারত তথা অন্যান্য দেশের পর্যটকেরা এখানকার গঙ্গা ঘাটের তীরে স্নান করে। প্রচলিত আছে যে, গঙ্গা নদীর জলে স্নান করলে মানব আত্মা ও দেহ পাপ শুদ্ধ হয়।

বৃন্দাবন : বৃন্দাবন যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। কৃষ্ণ ভক্তদের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তীর্থস্থান। বৃন্দাবনকে বলা হয় সেই জায়গা যেখানে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর শৈশব কাটিয়েছিলেন। শহরের নামটি বৃন্দা (যার অর্থ তুলসী) এবং ভ্যান (অর্থ গ্রোভ) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যা সম্ভবত নিধিবন এবং সেবা কুঞ্জ গ্রোভকে বোঝায়। জনপ্রিয় বাঁকে বিহারী মন্দির এবং ইসকন মন্দিরসহ বৃন্দাবন শহরে ভগবান কৃষ্ণ এবং রাধাকে উৎসর্গ করা প্রচুর মন্দির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

লখ্‌নউ : ইউপি পর্যটন স্থানের তালিকার শীর্ষে রয়েছে উত্তর প্রদেশের রাজধানী শহর লখ্‌নউ। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম শহর লখ্‌নউ পর্যটকদের হৃদয়গ্রাহী 'মুসকুরাইয়ে, কিয়ঙ্কি লখনউ মে হ্যায়' দিয়ে স্বাগত জানায়। যেকোনো খাদ্যপ্রেমী লখ্‌নউয়ের নানান স্বাদের খাবারসামগ্রী উপভোগ করে পরম তৃপ্তিতে। হরেক রকম রন্ধনপ্রণালি ও এসকল খাবারের সুগন্ধ বাতাসকে সুমিষ্ট গন্ধে ভরিয়ে তোলে এবং আত্মাকে সন্তুষ্ট করে।

এলাহাবাদ : এলাহাবাদ প্রয়াগরাজ নামে পরিচিত এবং এটি উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর মধ্যে একটি। এটি বিখ্যাত ত্রিবেণী সঙ্গমের বাড়ি; গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী নদীর মিলনস্থল। প্রাচীন শহর এলাহাবাদে প্রতিবছর মহা কুম্ভমেলার আয়োজন হয়ে থাকে যা বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু সমাবেশগুলোর মধ্যে একটি। এলাহাবাদে 'এলাহাবাদ ফোর্টে'র ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, চন্দ্র শেখর আজাদ পার্ক, অল সেন্টস ক্যাথেড্রাল, নেহরাসের পৈতৃক বাড়ি এবং এলাহাবাদ মিউজিয়ামসহ দেখার মতো অসংখ্য স্থান রয়েছে।

সারনাথ : সারনাথ হলো উত্তর প্রদেশের একটি দর্শনীয় বৌদ্ধ স্থান। শহরটি বারাণসীর কাছাকাছি অবস্থিত এবং বুদ্ধের প্রথম ধর্মোপদেশের স্থান বলে মনে করা হয়। এটি বৌদ্ধদের জন্য একটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান।

মথুরা : মথুরা 'কৃষ্ণভূমি' নামেও পরিচিত। এটি উত্তর প্রদেশের একটি অন্যতম দর্শনীয় পর্যটন স্থান। বৃন্দাবনের কাছাকাছি এর অবস্থান। যমুনা নদীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা এ শহরটিতে অসংখ্য পুরোনো মন্দির রয়েছে। মথুরায় মোট ২৫টি ঘাট রয়েছে–যেখানে ভোর এবং সূর্যাস্তের সময় তীর্থযাত্রীরা ভিড় করে থাকে। মথুরার পুরোনো বৌদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট রয়েছে–যা একসময় হাজার হাজার ভিক্ষু এবং বেশ কয়েকটি মঠের আবাসস্থল ছিল।

ফতেপুর সিক্রি : মুঘল সম্রাট আকবর ১৫৭১ সালে আগ্রা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত একটি লাল বেলেপাথরের শহরে 'ফতেহপুর সিক্রি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি ১৫ বছর ধরে রাজার সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল এবং এটি মূলত একটি সুরক্ষিত শহর ছিল। এ শহরে যোধা বাইয়ের প্রাসাদ, বুলন্দ দরওয়াজা, জামা মসজিদ এবং সেলিম চিস্তির সমাধি ও কয়েকটি বিখ্যাত স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

বিন্ধ্যাচল : একটি বিশিষ্ট হিন্দু তীর্থস্থান হিসেবে সমধিক পরিচিত। যা মির্জাপুর এবং বারাণসীর মধ্যে অবস্থিত। পবিত্র গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এ শহরটি অনেক তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করে। অনেকেই এখানে স্নান এবং দেবী গঙ্গার কাছে প্রার্থনা করতে আসে।

অযোধ্যা : সরায়ু নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যাকে হিন্দু ধর্মের সাতটি পবিত্র শহরের একটি বলে মনে করা হয়। হিন্দু পুরাণে অযোধ্যা ভগবান রামের জন্মস্থান এবং রামায়ণ মহাকাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। জৈন ধর্মের ২৪ জন তীর্থঙ্করের (ধর্মীয় শিক্ষক) মধ্যে চারজন এ আধ্যাত্মিক শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ স্থানটি পর্যটকদের দারুণভাবে আকর্ষণ করে থাকে।

ঝাঁসি : উত্তরপ্রদেশের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক গন্তব্য হিসেবে সমাদৃত। রানি লক্ষ্মীবাইয়ের সাথে ঝাঁসির সম্পৃক্ততার জন্য এ স্থানটি বিশেষভাবে পরিচিত। দর্শনার্থীদের কাছে ঐতিহাসিক কাহিনি উপস্থাপন করার পাশাপাশি, ঝাঁসিকে প্রায়ই ওরছা এবং খাজুরাহোর প্রবেশদ্বার হিসেবে উল্লেখ করা হয়। চান্দেলা রাজবংশগুলোও এ ঐতিহাসিক শহরে অবস্থিত ছিল।

ফিরোজাবাদ : ফিরোজাবাদ শহরটি উত্তরপ্রদেশের আগ্রা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি একটি শিল্প সমৃদ্ধ নগরী। সূক্ষ্ম কাচের পাত্র, পুঁতি এবং চকচকে চুড়ি তৈরি করার জন্য ফিরোজাবাদ ব্যাপক আন্তর্জাতিক প্রশংসা পেয়েছে। পাশাপাশি এ অঞ্চল উচ্চমানের রঙিন গহনা এবং পোশাকের জন্যও ব্যাপকভাবে পরিচিত।

সোনভদ্র : সোনভদ্র দেশের একমাত্র জেলা যার সীমান্তে চারটি রাজ্য রয়েছে : এমপি, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং বিহার। এ জেলাটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত সোন নদীর বন্য প্রবাহ দ্বারা বেষ্টিত। এখানে অনেকগুলো স্মৃতিস্তম্ভ এবং দুর্গ রয়েছে যা প্রচুর সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করে। ৪০০০ বছরেরও বেশি পুরোনো গুহাচিত্রগুলো এ স্থানটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে।

মিরাট : মিরাট একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যা ইতিহাস এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য বিখ্যাত। উত্তর প্রদেশের এ ঐতিহাসিক শহরটি নতুন দিল্লি থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মিরাট প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক শিল্প সমৃদ্ধ দর্শনীয় পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম।

সংস্কৃতি : বৈদিক সাহিত্যের একাধিক ধর্মগ্রন্থ উত্তরপ্রদেশ ভূখণ্ডে রচিত হয়েছিল। হিন্দু বিশ্বাস অনুসারে, গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা তিথিতে ব্যাস এ অঞ্চলেই বেদকে চার ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। গুরুপূর্ণিমাকে হিন্দুরা ব্যাসের জন্মতিথিও মনে করেন। এ রাজ্যের একটি দীর্ঘ সাহিত্য ও লৌকিক হিন্দি ভাষার প্রথা রয়েছে। উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে জয়শঙ্কর প্রসাদ, মৈথিলীশরণ গুপ্ত, মুন্সি প্রেমচন্দ, সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী নিরালা, বাবু গুলাবরাই, সচ্চিদানন্দ বাৎস্যায়ন, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হরিবংশ রাই বচ্চন, ধরমবীর ভারতী প্রমুখ সাহিত্যিকের হাত ধরে হিন্দি সাহিত্যের আধুনিকীকরণ ঘটে।

উত্তরপ্রদেশ রাজ্যটিকে 'ভারতের হিন্দিবলয়ের কেন্দ্র' বলা হয়। ১৯৫১ সালের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যভাষা আইন অনুসারে হিন্দিকে এ রাজ্যের সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সালে এ আইনে একটি সংশোধনী এনে রাজ্যের অন্যতম ভাষা উর্দুকেও সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়।

সঙ্গীত ও নৃত্যকলা : অণুপ জালোটা, বাবা সেহগল, গিরিজা দেবী, গোপাল শঙ্কর মিশ্র, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, কিশান মহারাজ, বিকাশ মহারাজ, নৌশাদ আলি, রবি শঙ্কর, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, তালাত মাহমুদ ও উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ প্রমুখ সঙ্গীতজ্ঞেরা উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। গজল গায়িকা বেগম আখতারও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। উত্তরপ্রদেশের ব্রজ অঞ্চলে 'রাসিয়া' নামে এক ধরনের সঙ্গীত খুব জনপ্রিয়। এ গানের মূল বিষয় হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম। রাজ্যের অন্যান্য জনপ্রিয় সঙ্গীতধারাগুলো হলো কাজরি, সোহর, কাওয়ালি, ঠুংরি, বিরহা, চৈতি ও সাওয়ানি। শাস্ত্রীয় নৃত্য 'কথকে'র উৎপত্তিও উত্তরপ্রদেশ ভূখণ্ডে। এ নৃত্যশৈলিটি হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবলা ও পাখোয়াজের সংগতে এটি উপস্থাপনা করা হয়। উত্তরপ্রদেশে কথকের দুটি ঘরানা রয়েছে। এগুলো হলো লখ্‌নউ ঘরানা ও বারাণসী ঘরানা।

উৎসব : দেওয়ালি ও রামনবমী উত্তরপ্রদেশের জনপ্রিয় উৎসব। প্রতি তিন বছর অন্তর যথাক্রমে এলাহাবাদ, হরিদ্বার ও উজ্জয়িনীতে গঙ্গার তীরে এবং নাসিকে গোদাবরীর তীরে কুম্ভমেলা আয়োজিত হয়। এলাহাবাদের কুম্ভমেলা উত্তরপ্রদেশের একটি বিখ্যাত মেলা। দোল উৎসবের দিন 'লাথ মার হোলি' এ রাজ্যের একটি স্থানীয় হিন্দু উৎসব। হোলি উৎসবের আগে মথুরার কাছে বরসনাতে এ উৎসব পালিত হয়। 'তাজ মহোৎসব' হলো আগ্রার একটি বার্ষিক উৎসব। এটি ব্রজ এলাকার সংস্কৃতির একটি বর্ণময় প্রদর্শনী। 'বুদ্ধপূর্ণিমা' বা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন একটি প্রধান হিন্দু ও বৌদ্ধ উৎসব। অন্যদিকে সংখ্যালঘু খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের কাছে 'বড়দিন' একটি প্রধান উৎসব। অন্যান্য উৎসবের মধ্যে বিজয়া দশমী, মকর সংক্রান্তি, বসন্ত পঞ্চমী, আয়ুধ পূজা, গঙ্গা মহোৎসব, জন্মাষ্টমী, সারধানা খ্রিষ্টান মেলা, শিবরাত্রি, মহরম, বারহ্ ওয়াফাত, ঈদুল ফিতর, ঈদুজ্জোহা, ছটপূজা, লখ্‌নউ মহোৎসব, কাবোব ও হনুমান জয়ন্তী উল্লেখযোগ্য।

অর্থনীতি : উত্তরপ্রদেশ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। এ রাজ্যের মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ₹ ৯,৭৬৩ বিলিয়ন (US$ ১১৯.৩৪ বিলিয়ন)। কৃষি ও চাকরিক্ষেত্র এ রাজ্যের অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ। চাকরিক্ষেত্রের মধ্যে পর্যটন, হোটেল ব্যবসা, রিয়েল এস্টেট, ফাইনানসিওর ও ফাইনান্সিয়াল কনসাল্টেন্সি অন্তর্ভুক্ত। উত্তরপ্রদেশ স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ভারতীয় রাজ্যগুলোর মধ্যে তৃতীয়। যার পরিমাণ ২২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গ্রিস দেশের সমতুল্য। এ রাজ্যে শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার ভারতের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে। ১৫-২৯ বর্ষীয়দের ৩১.১% এবং সামগ্রিকভাবে ৪৩.২% অংশগ্রহণ রয়েছে মাত্র। ২০১৫-১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী চাল উৎপাদনে এ রাজ্য ভারতে দ্বিতীয়। প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন টন চাল উৎপাদন হয়। ২০১৫-১৬ সালের হিসাব অনুযায়ী গম উৎপাদনে এই রাজ্য ভারতে প্রথম। প্রায় ২৬.৮৭ মিলিয়ন টন গম উৎপাদন হয়।

পরিবহণ : ভারতের রাজ্যগুলোর মধ্যে উত্তরপ্রদেশেই রেলপথের দৈর্ঘ্য সর্বাধিক। এ রাজ্যের রেলপথের ঘনত্ব সারা দেশে ষষ্ঠ উচ্চতম। ২০১১ সালের হিসাব অনুসারে, রাজ্যের রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৮,৫৪৬ কি.মি. (৫,৩১০ মা.)। এলাহাবাদ উত্তর-মধ্য রেলের প্রধান কার্যালয়। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে একটি দীর্ঘ ও বহুমুখী পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের দ্রুততম শতাব্দী এক্সপ্রেস, লখ্‌নউ স্বর্ণ শতাব্দী এক্সপ্রেস ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লি ও লখ্‌নউ শহরের মধ্যে চলাচল করে। এ রাজ্যের সড়ক পরিবহণ নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য দেশের রাজ্যগুলোর মধ্যে বৃহত্তম। জাতীয় সড়কগুলোর মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ শুধু প্রতিবেশী নয়টি রাজ্যের সঙ্গেই নয়, বরং প্রায় সারা দেশের সঙ্গেই ভালোভাবে যুক্ত রয়েছে। এ রাজ্যে ৪২টি জাতীয় সড়ক রয়েছে। এগুলোর দৈর্ঘ্য ৪,৯৪২ কি.মি. (ভারতের জাতীয় সড়কগুলোর সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের ৯.৬%)। উত্তরপ্রদেশের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত। রাজ্যে দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। লখ্‌নউতে চৌধুরী চরণ সিং বিমানবন্দর ও বারাণসীতে লালবাহাদুর শাস্ত্রী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। আগ্রা, এলাহাবাদ, গোরখপুর ও কানপুরে চারটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর রয়েছে।

গণমাধ্যম : উত্তরপ্রদেশ থেকে হিন্দি, ইংরেজি ও উর্দুতে একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫ সালে জর্জ অ্যালেন এলাহাবাদে 'দ্য পায়োনিয়ার' পত্রিকাটি চালু করেন। অমর উজালা, দৈনিক ভাস্কর, দৈনিক জাগরণ ও হিন্দুস্তান দৈনিক–এ রাজ্যের জনপ্রিয় সংবাদপত্র। এছাড়াও দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান টাইমস, দ্য হিন্দু, দ্য স্টেটসম্যান, দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ও এশিয়ান এজ প্রভৃতি ইংরেজি সংবাদপত্র এ রাজ্য থেকে প্রকাশিত হয় এবং ব্যাপক হারে বিক্রি হয়। দি ইকোনমিক টাইমস, দ্য ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, বিজনেস লাইনস ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এ রাজ্যের কয়েকটি বহুল প্রচারিত অর্থনৈতিক দৈনিক পত্রিকা। হিন্দি, নেপালি, গুজরাতি, ওড়িয়া, উর্দু ও পাঞ্জাবি ভাষার কিছু সংবাদপত্রের পাঠকও এ রাজ্যে বাস করেন। দূরদর্শন এ রাজ্যের সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল।

শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্যকলা, ধর্মীয় দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বহুকৌণিক ও বহুরৈখিক জনজীবনের বিচিত্র রঙে সমৃদ্ধ ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য–যা ভ্রমণপিপাসুদের জন্য জ্ঞানার্জন ও আনন্দ উপভোগের এক মহাভূমি। •

সৈয়দ শিহাব হোসেন
শিক্ষার্থী, বাংলা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার মতামত জানান

যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল

ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন : ১১৪২

inf2.dhaka@mea.gov.in

ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

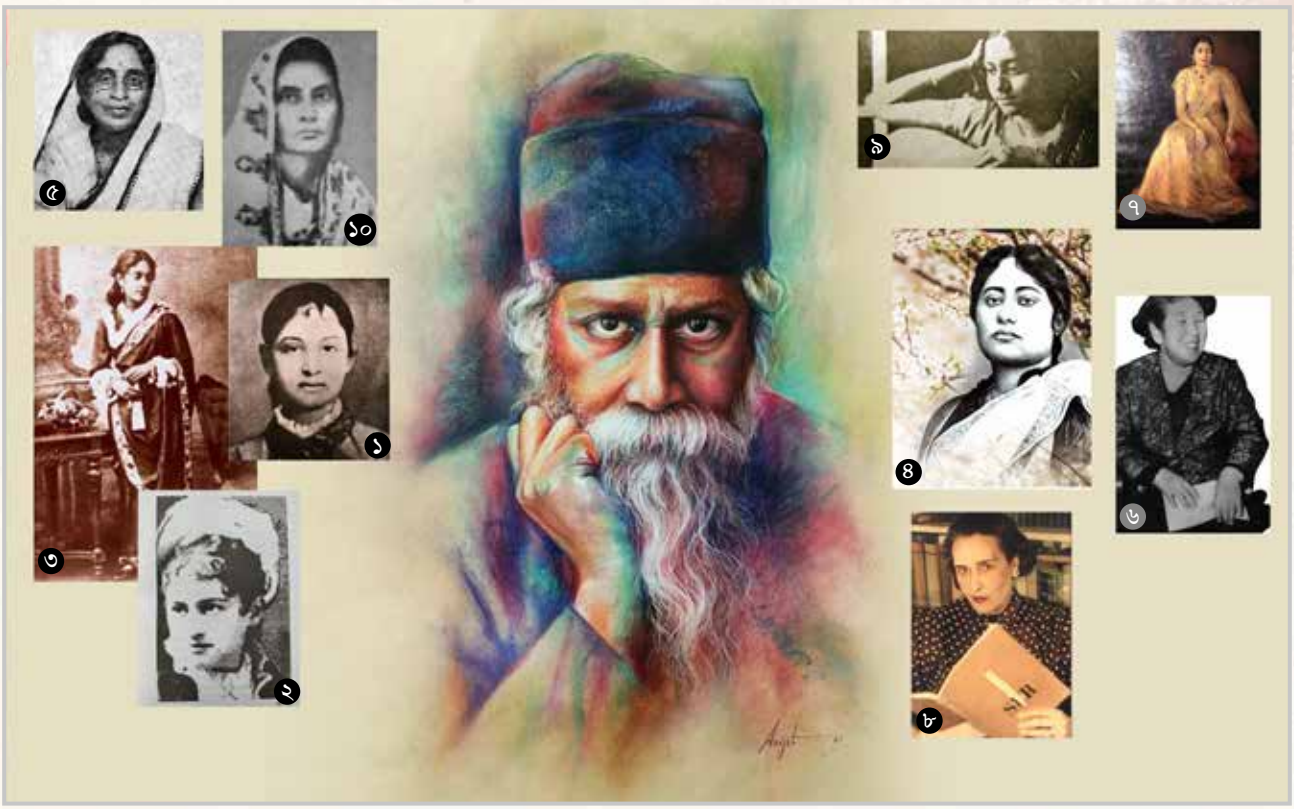

রবীন্দ্রজীবনে দশ নারী

স্বপঞ্জয় চৌধুরী

ফিচার

একজন কবি কিংবা সাহিত্যিক মূলত প্রেমের পূজারি। সে প্রেম কেবল ঈশ্বরপ্রেম কিংবা বিশ্বমানবতার প্রেমের মধ্যেই আবদ্ধ থাকবে, তা নয়। বরং তা ব্যাপৃত হতে পারে ব্যক্তিপ্রেমে। কবি ব্যক্তির সৌন্দর্য কিংবা শৈল্পিক আকুতিতে মোহগ্রস্ত হতে পারে, যা কখনো জৈবিক ক্ষুধার বারান্দা মাড়িয়ে আত্মিক ক্ষুধা মেটাতে নিবৃত থাকে। কখনো কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কবি দেখেন ধোঁয়াচ্ছন্ন প্রেমিকার মুখ আবার কখনো-বা নিস্তব্ধ রাত্রিতে কবির লেখার টেবিলে নিবিড়ভাবে তাকিয়ে কবিকে দেখেন কোনো এক মানবী সে সাময়িক হ্যালুসিনেশন ঘটিয়েই আবার মিলিয়ে যান। কবির কাছে অবশিষ্ট থাকে শুধু অন্তসারশূন্য অনুভূতিটুকু। কবিকুলের শিরোমণি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অসম্ভব রোম্যান্টিক একজন কবি। যিনি তাঁর বর্ণিল জীবনে অসংখ্য প্রেমে জড়িয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে আমরা মোটামুটি ১০ জন প্রেমিকার সন্ধান পাই। যারা হলেন–আনা তড়খড়[১], লুসি স্কট[২], কাদম্বরী দেবী[৩], মৃণালিনী দেবী[৪], ইন্দিরা দেবী[৫], তোমিকো ওয়াদা কোরা[৬], রানু মুখার্জি[৭], ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো[৮], মৈত্রেয়ী দেবী[৯] ও হেমন্তবালা[১০]। কত বিচিত্র বিষয়ের প্রেমে মজেছিলেন যে, কবিসৃষ্ট শিল্পের দিকে তাকালে খুব সহজেই তা অনুমান করা যায়। কবির শিল্পচর্চায় প্রকৃতি প্রেমের মতোই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে নারীর প্রেম। প্রেমের সেই প্রকাশ তিনি যেভাবে করেছেন তা বাংলার শিল্প সাহিত্যের ভান্ডারকে করেছে ঐশ্বর্যময়

আনা তড়খড় : প্রথম নারী

বরীন্দ্রনাথের প্রথম প্রেমে পড়ার খবর পাওয়া যায় তার ১৭ বছর বয়সে। মেয়েটির আসল নাম আনা তড়খড়। সবাই চিনত অন্নপূর্ণা দেবী নামে। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে যাবার আগে রবি গিয়েছিলেন মেজ দাদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। তিনি তখন আহমেদাবাদের সেশান জাজ। মেজদাদা বোম্বেতে তার বন্ধুর বাসায় পাঠিয়েছিলেন কিশোর রবিকে, যাতে লন্ডনে যাবার আগে কিছু আদব কায়দা শিখে নিতে পারে। বন্ধু আত্মারাম পাণ্ডুরঙের বিলেত ফেরত মেয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর বয়স তখন বিশ বছর, কারো কারো মতে তেইশ, বরীন্দ্রনাথ তখন সবেমাত্র ১৭। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রেম তার চেয়ে ছয় বছরের বড় এই মারাঠি মেয়েটির সাথে। সময় ১৮৭৮। রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রেমিকার নাম দিয়েছিলেন নলিনী।

লুসি স্কট : প্রথম বিদেশিনী

সাল ১৮৭৯। রবীন্দ্রনাথ তখন লন্ডনে। বয়স ১৮। বিলেতের স্কট পরিবারের সাথে থাকতে শুরু করেছেন কবি। তাদের ঘরে চার মেয়ে। লুসি স্কট সবার ছোট। সেজো ও ছোট দুজনেই একসাথে প্রেমে পড়লেন সুদর্শন কবি রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন লুসিকে। রবীর জীবনের প্রথম বিদেশিনী। রবীর চেয়ে বয়সে ৬ বছরের বড় লুসি বেশ ভালো পিয়ানো বাজাতে পারতেন। তাদের প্রেমময় দিনগুলোতে লুসি পিয়ানো বাজাতেন আর রবী গান গাইতেন। কখনো কখনো একসাথে গেয়ে উঠতেন দুজনে... 'ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়/ তটিনী হিল্লোলে তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়/ পিক কিংবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু গায়/ কি জানি কিসেরই লাগি প্রাণ করে হায়-হায়'... রবীর সাথে লুসির সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তবু লুসি তার পরের জীবনে আর কোন দিন বিয়ে করেননি।

কাদম্বরী দেবী : প্রথম প্রেম

১৮৮২ সাল। রবীন্দ্রনাথ ফিরেছেন বিলেত থেকে। দেড় বছর আগে রবী যে ছোট বৌঠানকে ছেড়ে গিয়েছিলেন বিদেশ সেই বৌঠান আর এখনকার বৌঠান যেন এক নয়। এ যেন নতুন এক মানুষের সাথে দেখা হলো কবির। এটাই রবীর জীবনের সবচেয়ে বড় প্রেমের সাথে পরিচয়। অনুভূতি ভাগাভাগি করা জীবনের প্রথম বন্ধু। যাকে রবি বলতেন 'জীবনের ধ্রুবতারা' যা সবসময় জ্বলে। বিলেত থেকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফিরেছেন রবীন্দ্রনাথ। দেড় বছর ধরে তার অপেক্ষায় আছে তার নতুন বৌঠান। যার নাম কাদম্বরী দেবী। কাদম্বরী যখন এই বাড়িতে আসেন তখন তার বয়স নয় বছর আর রবীন্দ্রনাথের সাত। দুজনে হয়ে উঠেছিলেন দুজনের খেলার সাথি।

মৃণালিনী দেবী : একমাত্র বউ

রবীন্দ্রনাথ বিয়ে করেন ২২ বছর বয়সে। বাংলাদেশের খুলনার মেয়ে মৃণালিনী দেবীর বয়স তখন ১০ বছর। সময় ১৮৮৩। তিনিই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র স্ত্রী। ঠাকুর বাড়ির কর্মচারী বেণীমাধবের কন্যা ছিলেন মৃণালিনী। পড়াশুনা গ্রামের স্কুলে। ডাকনাম ছিল ভবতারিণী। মাত্র উনত্রিশ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। তাদের উনিশ বছরের সংসারে দুই পুত্র ও তিন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে অতি অল্প বয়সেই রেণুকা ও শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। সংসার ধর্ম পালন করলেও রবীন্দ্রনাথের মনের নাগাল পাওয়া হয়তো সম্ভব হয়নি গ্রামের এই মেয়েটির। কবির চিঠিপত্রে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ইন্দিরা দেবী : ভাতিজির সাথে প্রেম

১৮৮৭ সালে ২৬ বছরের রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিঠি লেখেন ১৪ বছর বয়সী ইন্দিরাকে। ইন্দিরা মাত্র কিছুদিন আগেই বিলেত থেকে ফিরেছেন। ইন্দিরা দেবী ছিলেন ভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে। সম্পর্কে ভাতিজি। কাদম্বরী মারা যাবার পর রবীন্দ্রনাথের প্রাণের খবর সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন এই কিশোরী। ৫ বছরের সম্পর্কে ইন্দিরাকে ২৫২টি চিঠি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর এসময় স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে দিয়েছিলেন মাত্র ১৫টি চিঠি আর ৫টি সন্তানদের। চিঠির সংখ্যায় সম্পর্কের আঁচ পাওয়া যায়। কাদম্বরীর পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী এই অল্প বয়সী ইন্দিরা দেবী। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর উনিশ বছর পর ১৯৬০ সালে ১২ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন এই বিদুষী নারী।

তোমিকো ওয়াদা কোরা : জাপানি প্রেম

১৯১৬ সালে জাপান গেলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন তার বয়স ৫৫। কলেজছাত্রী তোমির বয়স তখন মাত্র ২০। তোমির কলেজেই অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন কবি। প্রথম দেখাতেই যেন প্রেম। দেশ কাল পাত্র সব ভুলে আজীবনের এক অদৃশ্য বন্ধনে যেন বাধা পড়লেন তোমি। সেবারই কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সাথে একটা ট্যুর হয় কবির। সেই সফরে আরো ঘনিষ্ঠ ও আন্তরিক হন তোমি ও রবীন্দ্রনাথ। তোমি ইংরেজি জানতেন। কবির ভাষণের অনুবাদের কাজটা করতেন তিনি। সাথে কবিকে দেখাশোনা, ঘর গোছানোসহ সকল কাজের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। কবির প্রেমে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি যে বালিশে লেগে থাকা কবির চুল সংগ্রহ করে রাখতেন গোপনে।

রানু মুখার্জি

রানু বারাণসীর মেয়ে। বাবা ফণিভূষণ অধিকারী বেনারসের হিন্দু ইউনিভার্সিটির দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে রানু তৃতীয়। রবীন্দ্রনাথের সাথে রানুর বয়সের তফাত পঁয়তাল্লিশ বছরের। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ৫৭ বছর তখন রানুর বয়স মাত্র ১২ বছর! রানুর জন্মই হয়েছিল ১৯০৬ সালে। তার ভালো নাম প্রীতি অধিকারী। ছোটবেলায় মায়ের মুখে রবিঠাকুরের গান শুনে শুনেই বড় হয়েছে রানু। বড় হবার পর গভীরভাবে পরিচিত হতে থাকে রবির লেখার সাথে। ১২ বছর বয়সে রানু প্রথম চিঠি লেখেন রবিবাবুকে। বয়সে ছোট হলেও বেশ বড় বড় কথা লিখতে লাগলেন চিঠিতে।

ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো : ওগো বিদেশিনী

সাল ১৯২৪ বিয়ের পর রানুর সাথে কবির সম্পর্কের ছেদ পড়েছে। রবিবাবু এবার যাচ্ছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুতে। জাহাজে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাত্রাবিরতি দিয়ে বিশ্রাম নিতে তাকে যেতে হয় আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়র্সে। এই খবর যখন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কাছে পৌঁছালো তখন তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। বিশ্বসাহিত্য তার ছিল বেশ জানাশোনা। জীবনের এমন কঠিন সময়ে রবীন্দ্রনাথের *গীতাঞ্জলি* তাকে জীবন যন্ত্রণায় কিছুটা শান্তি দিয়েছিল। পৃথিবীর অন্য প্রান্তের বৃদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথকে বসিয়েছিলেন মনের কোঠায়।

মৈত্রেয়ী দেবী : গুরুদেবের সঙ্গে প্রেম

রবীন্দ্রনাথের মোহময় যে ক্ষমতা তাতে অনেক নারীই মুগ্ধ হয়েছিলেন, সমর্পণ করেছিলেন নিজেকে। রবীন্দ্রনাথকে হৃদয়ে ধারণ করে অনেক নারীই হয়তো জীবনমন পার করেছেন। সে সংখ্যা নেহাতই কম হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সাড়া দিয়েছেন কতজনের ডাকে। সেটা খুবই গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়। স্নেহ, ভালোবাসা আর প্রেম সবই যেন একাকার হয়ে গিয়েছিলে একটি সম্পর্কে এসে, সেটি হলো মৈত্রেয়ী দেবীর সাথে রবির সম্পর্ক।

হেমন্তবালা : শেষ নারী

সাল ১৯৩১। সবেমাত্র প্যারিস থেকে ফিরেছেন কবি। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো এখনও কবির মনের কিনারায়। এমনি এক বিকেলে শান্তিনিকেতনের ঠিকানায় একটি অচেনা নারীর চিঠি আসে। নামের জায়গায় লিখা 'খদ্যোৎবালা'। কিছুদিন পর আবার চিঠি আসে। এবার 'দক্ষবালা' নামে। হাতের লেখা একই। খাদ্যোৎবালা জোনাকি এবার হয়েছেন দক্ষ বা প্রজাপতি। বোঝাই যাচ্ছে ছদ্মনামে নিজেকে কেউ আড়াল করছেন কবির কাছে। জোনাকি থেকে প্রজাপতির এমন রূপান্তর প্রবীণ রবি ঠাকুরের মনে কী যেন এক ভালোলাগা খেলতে লাগল। অপরিচিত এই নারীর সাথে শুরু হলো চিঠি চিঠি খেলা। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৭০। হেমন্ত বালাই একমাত্র নারী যার সাথে রবীন্দ্রনাথের বিচ্ছেদ ঘটেনি। বিচ্ছেদের আগেই পরপারে চলে যান বিশ্বকবি। •

স্বপঞ্জয় চৌধুরী
কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক

গণসংগীত সম্রাট হেমাঙ্গ বিশ্বাস

রকি গৌড়ি

গণসংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গানের কথায় ও সুরে ছিল শ্রমজীবী মানুষের হক বুঝে নেওয়ার কথা, সর্বহারা মানুষের অধিকারের কথা এবং দুঃখী মানুষের কথা।

এই শিল্পী ও সুরকার জন্মগ্রহণ করেন ১৯১২ সালের ১৪ ডিসেম্বর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের সিলেটের মিরাশী গ্রামে। তার পিতা জমিদার হরকুমার বিশ্বাস ও মা সরোজিনী। নাট্যান্দোলন ও বাংলা গণসঙ্গীতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বেগ আসে মিরাশী গ্রামের কৃতি সন্তান হেমাঙ্গ বিশ্বাসের হাত ধরে। একাধারে তিনি বহু বাংলা গণসঙ্গীতের কথা ও সুরের স্রষ্টাও।

১৯৩০ সালে হবিগঞ্জ সরকারি হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪২ সালের ১৮ জুলাইয়ে সিলেট টাউনের গোবিন্দচরণ পার্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সভাপতিত্বে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবিতে সুরমা ভ্যালী কালচারাল স্কোয়াড গঠিত হয়। এই স্কোয়াড নিয়ে তিনি ১৯৪৫ সালে সারা আসাম পরিভ্রমণ করেন এবং কুশল কুমারের ফাঁসি, কেবিনেট মিশনের কার্টুননৃত্য, দুর্ভিক্ষ নৃত্য, নৌ বিদ্রোহের ওপর গানের অনুষ্ঠান এবং ছায়ানাটক ইত্যাদি পরিবেশন করেন। ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত হন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আসাম প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক। বিভিন্ন নাটক, চলচ্চিত্র ও যাত্রায় সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তিনি–যার মধ্যে কল্লোল, তীর, তেলেঙ্গানা, ১৭৯৯, লাল লণ্ঠন, লেলিন, পদ্মা নদীর মাঝি, বিদুন, রাইফেল, রাহুমুক্ত রাশিয়া, মানুষের অধিকারে, কাঙ্গাল হরিশ্চন্দ্র অন্যতম। ১৯৮৩ সালে তিনি গানের দল নিয়ে বাংলাদেশে আসেন এবং ঢাকা ও সিলেটে অনুষ্ঠান করে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন।

তিনি লিখেছেন–'হবিগঞ্জে হঠাৎ এলো এক আন্দোলনের জোয়ার–আইন আদালতের শহরে উঠল আইন অমান্যের ঢেউ।' অসহযোগ আন্দোলনে হবিগঞ্জে একটি গান রচনা করেন যা সারা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'গান্ধী সজ্জিত বিরাট বাহিনী নির্ভয়ে চলিছে বাধা নাহি জানি, ভারতের মুক্তি কাম্য আমাদের এসো এসো সৈনিক ডাকিছে সেনানী। লবণ শুল্ক করগো ভঙ্গ ছেড়ে দাও আমোদ, ছেড়ে দাও রঙ্গ, অহিংস ধর্মে আচ্ছাদি অঙ্গ দাওগো সাজায়ে জননী, ভগিনী।' হেমাঙ্গ বিশ্বাস আরও লেখেন, 'মিছিলের সুর ও স্টাইল ক্রমশ বদলে যেতে লাগল। এই প্রথম গৃহবধূরা মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে মিছিলে যোগ দিলেন। 'না জাগিলে ভারত ললনা/ এ ভারত আর জাগে না, জাগে না'–ললনাদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল রাস্তার পাশের দর্শকদের ঔৎসুক্যও ততই বাড়তে লাগল। কে কোন বাড়ির বউ তা নিয়ে একটা গবেষণা চলত। আন্দোলনের হাওয়া বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথার ঘোমটাও উপরে উঠতে লাগল; মুখগুলো স্পষ্ট দেখা গেল। শ্রীমতী সুমতি নাগ, সুখদা সুন্দরী পাল চৌধুরী, শোভনবালা দেব প্রমুখরা কেবল মাথার ঘোমটা সরালেন না; জনসভায়, বক্তৃতার মঞ্চেও তাদের দেখা যেতে লাগল। ১৯৩৮-৩৯ সালে বিনয় রায়, নিরঞ্জন সেন, দেবব্রত বিশ্বাস প্রমুখের সঙ্গে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বা আই পি টি এ গঠন করেন। পঞ্চাশের দশকে এই সংঘের শেষ অবধি তিনি এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এর আগে ১৯৩৫ সালে তিনি কারাবন্দি থাকাকালে যক্ষারোগে আক্রান্ত হন। তারপর যাদবপুর হাসপাতালে কিছুকাল চিকিৎসাধীন থাকেন এবং সেই কারণে তিনি মুক্তি পান। ১৯৪২ সালে বাংলার প্রগতিশীল লেখক-শিল্পীদের আমন্ত্রণে তিনি প্রথম কলকাতায় আসেন সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর উদ্যোগে এবং জ্যোতিপ্রকাশ আগরওয়ালের সহযোগিতায় সিলেট গণনাট্য সংঘ তৈরি হয়। স্বাধীনতার আগে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গানের সুরকারদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রধান। সেই সময়ে তাঁর গান–'তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শান, কিষাণ ভাই তোর সোনার ধানে বর্গী নামে' প্রভৃতি অসম ও বাংলায় সাড়া ফেলেছিল। ১৯৫৬ সালে তিনি চিকিৎসার জন্য চীনে যান। আড়াই বছর সেখানে খুব কাছে থেকে দেখেন চীনের সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ১৯৬১ সালে স্থায়ীভাবে চলে আসেন কলকাতায় এবং সেই সময়েই চাকরি নেন সোভিয়েত কনস্যুলেটের 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরে। চীন-ভারত মৈত্রীর ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল। তিনি দুবার চীনে গিয়েছেন। চীনা ভাষায় তাঁর অনেক গান আছে। ১৯৭১ সালে মাস সিঙ্গার্স নামে নিজের দল গঠন করে জীবনের শেষ দিকেও তিনি গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে বেরিয়েছেন। তিনি কল্লোল, তীর, লাল লণ্ঠন প্রভৃতি নাটকের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। লাল লণ্ঠন নাটকে তিনি বিভিন্ন চীনা সুর ব্যবহার করেছিলেন। রাশিয়ান গানও অনুবাদ করেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্গীত 'ইন্টারন্যাশনাল' ও রাশিয়ান সুরে তার গাওয়া 'ভেদী অনশন মৃত্যু তুষার তুফান' গানটি 'In the call of comrade Lenin' এর ভাবানুবাদ। এটি কমিউনিস্ট কর্মীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়। তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা হলো : শঙ্খচিলের গান, জন হেনরীর গান, মাউন্টব্যাটেন মঙ্গলকাব্য, বাঁচব বাঁচব রে আমরা, মশাল জ্বালো, সেলাম চাচা, আমি যে দেখেছি সেই দেশ প্রভৃতি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গান ও শঙ্খচিলের গান তাঁর গানের সংকলন। বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থ লোকসঙ্গীত শিক্ষা। এছাড়াও কুল খুরার চোতাল, আকৌ চীন চাই আহিলো, জীবন শিল্পী জ্যোতিপ্রসাদ, লোকসঙ্গীত সমীক্ষা বাংলা ও অসম, উজান গাঙ বাইয়া, হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাবলী (প্রকাশক : অসম প্রকাশন পরিষদ) সাল ২০০৮ প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি লিখলেন, শোন দেশের ভাই ভগিনী শোন আচানক কাহিনী, কাঁদো বাংলা জননী। ১৯৬৫ সালে অনুবাদ করেন 'আমরা করবো জয়' মার্কিন লোকসঙ্গীত শিল্পী পিট সিগারের গাওয়া সেই জনপ্রিয় গানটি 'we shall overcome।' তিনি গণসঙ্গীত গেয়ে যেভাবে আন্দোলন করতেন এবং সাধারণ মানুষদের নিজ অধিকার সম্পর্কে উজ্জীবিত করতেন, সেটা আমাদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও অনুকরণীয়। গণসঙ্গীত যে আন্দোলনের শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে, সেটা আমরা '৪৭-এর স্বাধীনতা আন্দোলন, '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, আন্দোলন থেকেই উপলব্ধি করেছি। গণসঙ্গীতের এই মুকুটবিহীন সম্রাটের জীবনাবসান ঘটে ১৯৮৭ সালের ২২ নভেম্বর, কলকাতার একটি হাসপাতালে। •

রকি গৌড়ি ॥ লেখক

বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা

ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী (বাপু) এবং বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই দুই কালজয়ী ব্যক্তিত্বকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে গুলশানস্ত ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে তৈরি করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু-বাপু ডিজিটাল গ্যালারি। ৭ ডিসেম্বর ২০২৩-এ মাননীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ যৌথভাবে এই গ্যালারির শুভ উদ্বোধন করেন।

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, December, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।